স্বামী বাগীশানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ
হাওড়া-৭১১ ২০২

প্রকাশক ঃ
স্বামী স্মরণানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১ ২০২

২৪ মার্চ ২০২১
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ১৫ টাকা

মুদ্রক ঃ
সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট
৯/৩, কে পি কুমার স্ট্রীট
বালি, হাওড়া-৭১১ ২০১

শ্রীমৎ স্বামী বাগীশানন্দজী মহারাজ

সে-কাল সদ্য স্বাধীন-হওয়া ভারতের ধীর-জাগৃতির মন্থর লগ্ন। একদিকে কত স্বপ্নের আকার দেওয়ার প্রযত্ন ; আর একদিকে অনেক না-পাওয়ার যন্ত্রণা। একদিকে নতুন দেশ গঠনের লড়াই, আর একদিকে নানা ভাঙ্গনের সুর। দেশকে গড়ে তোলার সেই পর্বে এগিয়ে এসেছিল রামকৃষ্ণ মিশন। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান তখন জাতির জীবনে এনে দিয়েছে নতুন কালের দিশা। অনেক নিরাশার মধ্যেও তাই বিবেকানন্দের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন একদল যুবক। এমনই এক কালপর্বে রচিত হচ্ছে কলকাতার অনতিদূরে কামারহাটি-আগরপাড়ার কলেজ-পড়ুয়া এক কিশোরের জীবন-আখ্যায়িকা। প্রথাগত অধ্যয়নের পাশাপাশি তার জীবনেও পৌঁছে গেছে বিবেকবাণীর বৈশাখী ঝড়ের ছোঁয়া। দুরন্ত-প্রাণ বিবেকানন্দের ডাক নিষ্ফল হয় নি তাঁর জীবনে। তাই স্কুল-জীবনের যিনি ছিলেন 'ক্যাপ্টেন', জীবন-অধিদেবতার সেই ডাকে, তিনিই অন্য অধিনায়কত্বের অদূরগত ভাবী পথে শুরু করলেন তাঁর অনিবার্য অনবদ্য অভিযাত্রা। তিনিই আজ আমাদের সকলের প্রণম্য পূজ্যপাদ স্বামী বাগীশানন্দজী মহারাজ।

শ্রীমৎ স্বামী বাগীশানন্দজীর জন্ম হয়েছিল এখনকার বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় ১৯৩০-এর ১২ জানুয়ারি তারিখে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি যোগদান করেন বেলুড় মঠের পার্শ্বস্থিত শাখাকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠে ১৯৫৪-র ১ ফেব্রুয়ারি।

তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সমরেশ চন্দ্র মিত্র। বাবা ছিলেন শ্রী রমেশ চন্দ্র মিত্র। মায়ের নাম ছিল শ্রীমতী পঙ্কজবালা মিত্র। মহারাজরা ছিলেন পাঁচ ভাই ও দুই বোন। মহারাজ নিজে ছিলেন বাবা-মার চতুর্থ সন্তান। পূজ্যপাদ মহারাজজীর বাবা ছিলেন স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের বি-এন-আর-এর তথা পরবর্তীকালের ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজের আডিটর। আজকের বাংলাদেশের নোয়াখালির রফিকপুর গ্রামে তাঁদের আদি বাসভিটা ছিল। যদিও তাঁর বাবাকে কর্মসূত্রে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হতো। মামার বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। সেখানেই জন্ম হয় তাঁর। পরে তাঁরা কলকাতার অনতিদূরে একটি বাড়িতে এসে থেকেছেন দীর্ঘদিন। এই বাড়ীটি ছিল অখণ্ড চব্বিশ পরগণা তথা বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগণার আগরপাড়া কামারহাটি অঞ্চলের উত্তর স্টেশন রোড এলাকায়। ছাত্রজীবনে সাইকেল চালাতে ভালবাসতেন মহারাজ। দীর্ঘক্ষণ সাইকেল চালিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় কর্মসূত্রে চলে যেতে তাঁর কোন ক্লান্তিবোধ হতো না। আর ভালবাসতেন সাঁতার কাটতে। পরবর্তীকালে নিজেও বলতেন যে, এই দুটি বিষয় ছিল তাঁর 'হবি'।

১৯৪০ সালে দেওঘরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে ভর্তি হন মহারাজ ক্লাস ফোরে। সেখানেই ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশুনা করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ

করেন ১৯৪৭ সালে। বিদ্যাপীঠ জীবনে যথেষ্ট ভালো ছাত্র ছিলেন মহারাজ। রামকৃষ্ণ সংঘের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী যিনি একসময় দেওঘর বিদ্যাপীঠেরও দায়িত্ব সামলেছেন, তাঁকে মহারাজ বলতেন, 'জানো তো আমি কিন্তু আমার সময়ে দেওঘর বিদ্যাপীঠের বেস্ট ছাত্র।' সত্যই এখানে পড়াকালীন অধ্যয়ন ছাড়াও অন্যান্য নানাদিকে তাঁর দক্ষতার কথা স্মরণ করেন অনেকেই। জুনিয়ার ছাত্রদের সকালের ড্রিল করাবার ভার ছিল মহারাজের উপর। নিজে একজন ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, বাস্কেটবল ইত্যাদি সবরকম খেলাতেই মহারাজ অংশ নিতেন। শুধু অংশ নিতেন তাই নয়, মহারাজ ছিলেন স্কুল ফুটবল টিমের অধিনায়ক। খুব দক্ষ গোলকিপার ছিলেন তিনি। ক্রিকেটেও খুব ভালো ফাস্ট বোলিং করতে পারতেন।

এরপর ১৯৪৭ সালে আই এস সি-তে ভর্তি হন কলকাতার সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে। তখন অবশ্য তিনি কলকাতার গৌরীপুরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস্ হোম-এ থাকতেন। এরপর ১৯৪৯-এ আই এস সি পাশ করে ভর্তি হন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে এবং সেখান থেকেই বিজ্ঞানে স্নাতক স্তরের পড়াশুনা শেষ করেন ১৯৫২ সালে। কিছুদিন তিনি এরপর কলকাতার হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারির পড়াশুনাও করেছেন। তবে জীবনের ভিন্ন পথে চলার ডাক এসে গিয়েছিল তাঁর মনের পৃথিবীতে, তাই শেষ হয় নি এই পড়াশুনা। ইতিমধ্যেই অবশ্য বেলুড় মঠে সারদাপীঠের জনশিক্ষামন্দিরে স্বেচ্ছাসেবকের কাজে মাঝে মাঝেই চলে যেতেন।

হস্টেল থেকে আগরপাড়ার বাড়িতে ফিরে মাঝে মাঝেই সামনের বড় পুকুরের পাড়ে গিয়ে বসে থাকতেন তিনি। দীর্ঘক্ষণ একমনে চুপচাপ সে বসে থাকা। সূর্য নামত অস্তাচলে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসত পুকুরের পারে। কোন্ এক গভীর আত্মমগ্নতায় শান্ত হয়ে থাকতেন তিনি। সেকালে যাঁরাই তাঁকে দেখেছেন, তাঁরাই এই মুহূর্তগুলির কথা মনে করেছেন বারবার। কে জানে, দিনান্তের অস্তগামী সূর্য জীবনের কোন্ অনিত্যতার পাঠ দিয়ে গেছে তাঁকে নিত্য সেই প্রদোষ-গোধূলিতে।

পড়াশুনা তার তখন প্রায় শেষের দিকে। স্নাতক স্তরের পাঠ শেষ হয়েছে সদ্য। রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস্ হোমের ছাত্রাবাসে থাকতেন তিনি। মাঝে কখনো কখনো বাড়িতে আসতেন মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের কাছে। এমনই একদিন বাড়িতে এসে বড় দাদার স্ত্রী আর নিজের ছোট বোনকে নিয়ে চললেন একটা সিনেমা দেখাবেন বলে। বারবার জানতে চাওয়া হলেও সিনেমার নাম তিনি কিছুতেই বলতে চাইলেন না। যাইহোক তিনজনে মিলে পৌঁছে গেলেন সিনেমা হলে। বড় বৌদি তো সিনেমা হলে ঢুকতে গিয়েই অবাক, সিনেমাটি সদ্য মুক্তি পাওয়া 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। চৈতন্য মহাপ্রভুর অপূর্ব মহিমান্বিত ত্যাগপবিত্র জীবন অবলম্বনে নির্মিত এটি। হঠাৎ কেন এমন সিনেমা দেখা ও

দেখানো ? বাড়ির সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন সেদিন, চলচ্চিত্রের অন্তরালে কোন্ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বাড়ির সকলের স্নেহের 'মানিক' তথা সমরেশ। ত্যাগের আদর্শের বহ্নিশিখা সেদিন প্রজ্বলিত হয়ে গেছে যে তার অন্তর্লোকে।

এরই মধ্যে একবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যোগদানের জন্যে উপস্থিত হন যুবক সমরেশ। কুম্ভস্নানে গিয়ে সনাতন ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনধারার যে অপূর্ব দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পেলেন তিনি, তা তাঁকে গতানুগতিক সাংসারিকতার বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। যে অসাধারণ এক জীবনপ্রদীপ জ্বলে উঠবে অনতিকালের মধ্যেই, তার সলতে পাকানোর কাজ অবশ্য শুরু হয়ে গিয়েছিল এর আগেই। দেওঘর বিদ্যাপীঠে পড়াশুনা আর রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের জীবনযাপন তাঁর মধ্যে অন্যতর জীবনপথের প্রতি আকর্ষণ তৈরী করে দিয়েছিল। সংসারের অজস্র মানুষ যে পথে তাদের জীবন বইয়ে নিয়ে চলেছে, সে পথ যে তাঁর নয়, এ বোধ তখনই তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়ে গেছে। প্রাক্-স্বাধীন ভারতের উত্তাল কালবলয়ে তাঁর যে কিশোর বয়স শুনতে পেয়েছিল রামকৃষ্ণ-ভাবপ্রবাহের অনন্য বাণী-বেদধ্বনি, সদ্য স্বাধীন ভারতের বিচিত্র ভাঙা-গড়ার সময়বৃত্তে সে কৈশোরই যৌবনের দীপ্ত পথে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' নবযুগের এই মহাবাক্যের উপলব্ধিলাভে ব্যাকুল হয়ে উঠল। খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরেণ্য ত্যাগব্রতীদের মৌনমুখর সাধনপথ। ভিতরে প্রবেশ করেছিল সামান্য-বেশী অর্ধশতাব্দী আগে ধ্বনিত হতে থাকা বিবেকানন্দের না-থামা এক প্রাণ-জাগানিয়া আহ্বান। 'তাঁহার বাঁশীর সুরে' 'প্রাণ-মন ভরে' উঠেছিল সেদিন যুবক সমরেশের। মনের ভিতরে আত্মগত সাধনার বেদীপীঠে লেখা হয়ে গিয়েছিল ভাবীকালের পথচলার সুনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞালিপি – 'আর আমি থাকিব না ঘরে'।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন সমরেশ। এসে পৌঁছলেন বেলুড় মঠের পাশেই অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠে। তারিখটা ছিল ১৯৫৪-র ১ ফেব্রুয়ারি। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করলেন তিনি। জীবনের স্বপ্ন পূর্ণ হল তাঁর। সাধুজীবনের এই সূচনার পর্বেই তিনি সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন সারদাপীঠের তদানীন্তন সম্পাদক পূজনীয় স্বামী বিমুক্তানন্দজী ও বিদ্যামন্দিরের প্রথম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী তেজসানন্দজীর। এই দুই মহান সাধকের জীবন ব্রহ্মচারী সমরেশের উপরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্মৃতিচারণায় বা ঘরোয়া আলোচনায় সে কথা উল্লেখ করতেন তিনি একাধিকবার। এছাড়াও আরো অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন পূজনীয় মহারাজ এই পর্বে। তাঁদের অনেকেই ছিলেন হয় সারদাপীঠে অথবা বেলুড় মঠে। এইসব অসামান্য সাধুজীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ তাঁর জীবনে না-মুছে-যাওয়া ছাপ রেখে গিয়েছিল। যে অনিন্দ্যসুন্দর এক দিব্য জীবন পূজ্যপাদ মহারাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, সে জীবনের সূচনা

পর্ব যে কত অমূল্য সাধকজীবনের পবিত্র স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছে, তা বলা বাহুল্য। নিজেই সেই মহৎ সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার মুহূর্তগুলির বর্ণনা দিয়েছেন অনবদ্য সহজ ভাষায়, "স্বামীজীর দু-চারখানা বই পড়ে বা সাধুসঙ্গ করে অনেকের বৈরাগ্য আসতে পারে ও সাধুজীবন যাপন করার ইচ্ছা জাগতে পারে। বাড়ি-ঘর, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে সঙ্ঘে যোগদান করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয় – কঠিন হচ্ছে সাধুজীবন গঠন করা। বেলুড় মঠের পাশেই সারদাপীঠ হওয়ায়, তখন শ্রীশ্রীমায়ের চেলা, রাজা মহারাজের চেলা, মহাপুরুষ মহারাজের চেলা ইত্যাদি অনেকে বেঁচে ছিলেন, যাঁরা দীর্ঘদিন সঙ্ঘকে সেবা করেছেন, তাঁদের কাছে প্রায়ই যেতাম। তাঁরা সস্নেহে তাঁদের সুদীর্ঘ সঙ্ঘজীবনের অনেক কথা বলতেন, যা আমাদের উৎসাহ দিত। ...তাঁরাই বলতেন (মজা করে), যখন রামকৃষ্ণ মেশিনে এসে পড়েছিস, তখন ভাবনা নেই ; এটা রামকৃষ্ণ মিশন নয়, রামকৃষ্ণ মেশিন। মনের যত আঁক-বাঁক, যত মান-অভিমান, অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি যারা আমাদের নিত্য সহচর – তারাই বহির্জগতের অ্যাকশান হিসেবে আমাদের অন্তরে গিয়ে সাথে সাথে রি-অ্যাকশান হয়ে নানা রূপে পরিণতি পাচ্ছে – ঐ রামকৃষ্ণরূপ মেশিন সাথে সাথে তা মনে করিয়ে দেবে, জানাবে যে সাধুর মন এসবের থেকে ঊর্ধ্বে বিচরণ করবে। সংসারের ধর্মই এই – এখানে স্বার্থ আছে, আঘাত করলেই প্রতিঘাত আছে। আর যে মন, প্রাণ, শরীর ও অহং ভগবানের কাছে সমর্পণ করেছে, তার মান-অপমানও নেই, ক্রোধ-হিংসাও নেই, সে বালকস্বভাবের হয়। এই রামকৃষ্ণ মেশিনই আমাদের চরিত্রের সব আঁকবাঁক সোজা করে দেবে, বালকের স্বভাবে পরিণত করবে।" পূজ্যপাদ মহারাজের এই অপূর্ব কথাতেই বোঝা যায় কি নিষ্ঠা নিয়ে, কি আন্তরিকতা নিয়ে, কি গভীরতা নিয়ে সাধুজীবনের প্রভাত কালের পুণ্য লগ্নগুলি যাপন করেছিলেন তিনি, কোন্ অনন্য সাধনায় অর্জন করে নিয়েছিলেন এই মহৎ সাধুসঙ্ঘের সোনার উত্তরাধিকার। রামকৃষ্ণ-ভাবপ্রবাহের উত্তরসাধকরাও আজ প্রণত শ্রদ্ধায় বোঝার চেষ্টা করে তাই, জনারণ্যের মধ্যে থেকেও কোন্ নীরব-বিরল নির্জনতার তপস্যায় নির্মিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এমন এক দুর্লভ সাধনবিগ্রহ – নাম তার 'স্বামী বাগীশানন্দ।'

সঙ্ঘে যোগদানের পরে ১৯৫৫ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯৫৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি স্বামী শঙ্করানন্দজীর কাছ থেকেই ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করেন। নাম হয় ব্রহ্মচারী স্মৃতিচৈতন্য। ১৯৬২-র ৮-ই মে শঙ্করজয়ন্তীতে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। সন্ন্যাসের পরে 'স্বামী বাগীশানন্দ' –এই নতুন নামকরণ হয় তাঁর।

সারদাপীঠের এই পর্বে সেবাযোগের বহুবিচিত্র ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছিলেন মহারাজ। সারদাপীঠে যোগদানের প্রথম পর্বে ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭-র কিছু

সময় পর্যন্ত তিনি সারদাপীঠের বিভিন্ন কাজে যুক্ত থেকেছেন। পরবর্তীকালে বিমুক্তানন্দজী ও তেজসানন্দজীর নির্দেশে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত মহারাজ কাজ করেছেন সারদাপীঠের অন্তর্গত বিদ্যামন্দির কলেজে। ১৯৫৮-৫৯ সালে বিদ্যামন্দিরের ওয়েস্ট হোস্টেলে (বর্তমান বিদ্যাভবন ছাত্রাবাস) অনিল মহারাজ অর্থাৎ পরবর্তীকালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শাখার অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দজীর সহকারী হিসেবে তিনি ছাত্রদের দেখাশুনার কাজ করতেন। পরের বছর ইস্ট হোস্টেলে অর্থাৎ বর্তমান শ্রীভবন ছাত্রাবাসে তিনি গোবিন্দ মহারাজ তথা পরবর্তীকালে দিল্লী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দজীর সহকারী রূপে কাজ করেন। স্বল্পভাষী মহারাজ অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে ছাত্রদের দেখাশুনার কাজ করতেন। কোন ছাত্র কোন অসুবিধা নিয়ে তাঁর কাছে গেলে মহারাজ আগ্রহভরে তার সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতেন। রসায়নের পরীক্ষণাগারে নিয়মিত যাওয়ার অবসর না পেলেও, কখন কখন ছাত্ররা তাঁকে পেয়েছে এবং কোন পরীক্ষণের কাজেও তাঁর সহায়তা লাভ করেছে তারা। পুরানো ছাত্ররা আজো স্মরণ করেন এই মিতবাক সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল মূর্তিখানি, তাঁর স্মিত হাসিভরা ব্যক্তিত্ব আজো তাদের স্মৃতিপথে অমলিন হয়ে আছে।

১৯৬০ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে স্বামী বিমুক্তানন্দজী সমরেশ মহারাজ তথা ব্রহ্মচারী স্মৃতিচৈতন্য মহারাজকে ডেকে এক বিরাট কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব তুলে দেন। ১৯৬০-৬১তেই বিদ্যামন্দির কলেজ ত্রিবার্ষিক ডিগ্রি কলেজে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছিল। সেই সংক্রান্ত নানা অনুমোদন তখন হয় এসে গেছে বা দ্রুত এসে যাবে। কিন্তু এই রূপান্তরের পর্বে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বিপুল পরিমাণে নতুন নির্মাণের, তা সে কলেজ বাড়িই হোক বা ছাত্রাবাস। পূজ্যপাদ মহারাজের কাঁধে এই বিরাট নির্মাণকাজের দায়িত্বই দেওয়া হয়েছিল। প্রথমদিকে স্বভাবত অন্তর্মুখ তিনি একটু সংকোচ বোধ করেছিলেন, কারণ এর আগে এমনতর কাজের পুঁথিগত বা ব্যবহারিক কোন জ্ঞানই তাঁর অর্জনে ছিল না। কিন্তু সার্থক বিবেকানন্দ-সৈনিক তিনি। তাই অচিরেই যাবতীয় জড়তা অতিক্রম করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই বিপুলায়তন কাজের মধ্যে। একজন অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ড্রাফ্‌টস্‌ম্যানের কাছ থেকে ধরে ধরে শিখে নিয়েছিলেন নির্মাণকাজের সমস্ত খুঁটিনাটি। বিদ্যামন্দির কলেজের রসায়ন বিভাগের বাড়িটি তৈরীর জন্যে প্রবল পরিশ্রম করেছেন তিনি। আজ দেখলে বোঝাই যায় না যে একটি পুরো ডোবার উপরে তৈরী হয়েছে এই সৌধখানি। পরবর্তীকালে মহারাজ নিজেই বর্ণনা করে বলেছেন যে কেমন করে ডোবার জল ড্রেন আউট করে, সাত থেকে আট ফুট নীচের পাঁক তুলে, শাল-বল্লা পাইলিং-এর উপরে আট ইঞ্চির রি-ইনফোর্স্‌ড্ কংক্রিট ঢালাই করে এই তিনতলা বাড়িটি তৈরী করেছিলেন তিনি। এই বাড়িটি ছাড়াও ফিজিক্স বিল্ডিং, নর্থ হোস্টেল বা বিবেক ভবন, সাউথ হোস্টেল বা বিনয় ভবন তৈরী করেছিলেন তিনি। এছাড়াও উল্লেখ্য এই তিনটি বাড়ির মাথাতেই তিনি যুক্ত করেছিলেন মন্দিরের চূড়া। তাঁর সেই অসামান্য সেবাশ্রমের সাক্ষীরূপে বিদ্যামন্দির সত্যিকারের 'মন্দির' হয়ে

উঠেছিল। বাড়ি তৈরীর পর বিমুক্তানন্দজী তাঁকে দায়িত্ব দেন কলেজের রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার পরীক্ষণাগার তৈরীর জন্যে। এক্ষেত্রেও পূজনীয় মহারাজের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের কথা সকলেই আজো স্মরণ করেন। স্বনামধন্য অধ্যাপক পি সি সেন ও জ্যোতির্ময় ব্যানার্জীর সঙ্গে তিনি নিজে প্রেসিডেন্সি, স্কটিশ চার্চ ও সেণ্ট জেভিয়ার্সের ল্যাবরেটরিগুলি দেখতে গিয়েছিলেন যাতে করে বিদ্যামন্দিরের ল্যাবরেটরি তৈরীর সময়ে কোন অসুবিধা না হয় এবং সেগুলিও যেন উচ্চমানের হয়। যেসব যন্ত্রপাতি কেনার দরকার ছিল সেগুলির অধিকাংশই ছিল বিদেশী। সেগুলি কীভাবে ও কোথা থেকে কেনা যাবে, কীভাবে সেগুলি ল্যাবরেটরিতে সেট করতে হবে, কারা তা করতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে পূজ্যপাদ মহারাজজী অধ্যাপকদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সমস্ত জেনে নেন এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সমগ্র কাজটি সুসম্পন্ন করেন। বস্তুতপক্ষে বিদ্যামন্দির কলেজের পরবর্তীকালের যে উন্নত পরিকাঠামো, তার যথাযোগ্য সূচনা মহারাজের হাতেই রূপায়িত হয়েছিল। বিদ্যামন্দিরের সেই সময়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা এবং ছাত্রেরাও এই স্বল্পভাষী অথচ অধ্যবসায়শীল নীরব সাধকের তৎকালীন অনবদ্য পরিশ্রমের কথা প্রণত কৃতজ্ঞতায় মনে করেন বারবার।

বিদ্যামন্দির ছাড়াও সারদাপীঠের অন্য বিভাগেও মহারাজ সেবানিরত থেকেছেন বেশ কয়েক বছর। সেই সময়েই সারদাপীঠের কাছাকাছি অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির ছেলেদের জন্যে তৈরী হয় জনশিক্ষামন্দির। তখন প্রায় ১০০টি কিশোর প্রতিদিন আসত সেখানে – তাদের ফ্রি কোচিং দেওয়া হত, বিকেলে খেলাধুলা করানো হত, বিকেলের টিফিনও দেওয়া হত তাদের। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার এবং ভ্রাম্যমাণ শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রও এই সময় চালু হয়ে গিয়েছিল। জনশিক্ষামন্দিরেরও এই আরম্ভকালে মহারাজ যুক্ত থেকেছেন, সেবা করেছেন গরীব মানুষদের। এছাড়াও সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে তৈরী হয়েছিল Social Education Organisers Training Centre বা SEOTC। এই কাজেও পূজ্যপাদ মহারাজজী যুক্ত হয়েছিলেন কিছুকালের জন্যে। ১৯৬৫-র এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬৭-র নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূজনীয় মহারাজ সারদাপীঠের সহ-সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

এইভাবেই দীর্ঘ তেরো বছরেরও বেশী সময় ধরে সারদাপীঠে সেবাকাজে নিয়োজিত থেকেছেন পূজ্যপাদ মহারাজ। ১৯৬৭ সালের ১৫-ই নভেম্বর সঙ্ঘের নির্দেশে তিনি সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন কলকাতার গোলপার্কে অবস্থিত ইন্সটিটিউট অব কালচারে। সারদাপীঠের এই দীর্ঘ সময়ের সেবাদানের স্মৃতি তাঁর জীবনে চিরকাল অম্লান হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখনই সে কথার অবতারণা করা হয়েছে, তখনই মহারাজ সে নিয়ে আলোচনা করেছেন গভীর আগ্রহের সঙ্গে। বিদ্যামন্দির তথা সারদাপীঠের ইতিহাসেও

তাঁর নীরব সেবার আখ্যানটি অনশ্বর কালপথে নিরবধি উজ্জ্বলতায় জেগে আছে। বেলুড় মঠ ও সারদাপীঠে সাধক জীবনগঠনের সূচনাকালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রবাহের যজ্ঞভূমিতে যে অগ্নি-আহুতি দানের প্রেরণা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তিনি, জীবনসাধনার হোমানলে সে আহুতি দিয়ে গেছেন তিনি অকাতরে। ইঁট-কাঠ-পাথরের প্রাসাদ তৈরী করেন নি তিনি, নির্মাণ করেছেন সেই 'মন্দির' যার অধিদেবতার কম্বুকণ্ঠ মন্দ্রস্বরে একদিন ঘরের আগল ভেঙে পৌঁছে গিয়েছিলেন আত্মমুক্তি-জগৎহিতের নবযুগসাধনার তীর্থতীরে। অনাগত ইতিহাস নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়েছিল সেদিন এক মহান সাধকের ক্রম-বিকাশশীল ভাবী জীবন-আলেখ্য রচনার জন্যে।

১৯৬৭ সালের শেষে গোলপার্কের ইন্সটিটিউট অব কালচারে সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব নিলেন তিনি। এখানেও তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়েছিলেন সকলে। একইরকম মিতভাষিতা অথচ নিয়মানুবর্তী জীবনচর্যা এই পর্বেও তাঁর জীবনে বহমান ছিল। গোলপার্কে অবশ্য খুব দীর্ঘ সময় সেবা করার সুযোগ তাঁর হয় নি, কারণ ১৯৭০-এর মার্চেই আর একটি বিরাট কাজের দায়িত্ব পান মহারাজ। এই সময়ে টাকিতে শুরু হয়েছে উদ্বাস্তু ত্রাণের বিশাল কর্মযজ্ঞ। মহারাজের ডাক পড়ল সেখানে। দীর্ঘ ছয়মাস এই অঞ্চলে থেকে নিষ্ঠাভরে ত্রাণকার্যে অংশ নিয়েছেন তিনি। ছিন্নমূল মানুষের বেদনার জীবন এই শান্ত সাধকের জীবনকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। মানুষের দুঃখ-কষ্টে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার এই সাধনা আজীবন তিনি সাধন করে গিয়েছেন। ১৯৭০-এর ডিসেম্বর মাসে নতুন কাজের ডাক এসে পৌঁছালো তাঁর কাছে। রাঁচি মোরাবাদি আশ্রমে সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে পৌঁছালেন তিনি। এরপর ১৯৭২-এর এপ্রিল মাস থেকে বেলুড় মঠের নির্দেশে মোরাবাদির সম্পাদকের আসনে অধিষ্ঠিত হন পূজ্যপাদ মহারাজ।

রাঁচি মোরাবাদিতে গ্রামাঞ্চলের কাজের উপর মহারাজের আগ্রহ ছিল দেখার মত। এছাড়াও আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীর জীবনগঠনের দিকেও বিশেষ নজর দিতেন মহারাজ। তাঁর সময়ে বেশ কয়েকজন যুবক এই আশ্রমে এসে সঙ্ঘে যোগদান করেন। তাদের সাধুজীবন তৈরীর দিকে মহারাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। প্রায় নিয়মকরেই, অনেক কাজের মধ্যেও, তাদের শাস্ত্রচর্চা করাতেন তিনি নিজে। এছাড়াও প্রথম থেকেই তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতেন অথচ সজাগ খেয়াল রাখতেন যাতে কাজটি সুসম্পন্ন হয় ও ঠাকুরের সেবারূপে নিষ্পন্ন হয়। ভালোবাসায় তাদের আপন করে নিয়েছিলেন তিনি। সেখানে বহিরঙ্গের উচ্ছ্বাস ছিল না, ছিল অন্তরের স্পর্শ। এক নবাগত ব্রহ্মচারীর পাঞ্জাবীটি পাশের দিকে একটু ছিঁড়ে গেছে। ব্রহ্মচারীটিও সেটি খেয়াল করে নি। মহারাজের কিন্তু নজর পড়েছে সেখানে। তাকে ডেকে মজা করেই বলছেন, 'কি হে, তুমি যে ছেঁড়া জামা পরেছো ? আমার দুর্নাম করবে দেখছি।' নতুন জামা করে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন এরপর। আশ্রমের সাধুরা

নিয়মিত সন্ধ্যারতি যাওয়া সহ আশ্রমের সমস্ত কার্যক্রমে ঠিক ঠিক অংশগ্রহণ করছে কিনা, এবিষয়টি সবসময় দেখার চেষ্টা করতেন তিনি।

রাঁচিতে বছর চারেক সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পর বেলুড় মঠের পরবর্তী নির্দেশে তাঁকে যেতে হয় মালদাস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়ে। ১৯৭৬-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৮২-র সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি মালদা আশ্রমের সম্পাদক পদে থেকে এই আশ্রম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের সেবাকাজে সময় অতিবাহিত করেছেন। সে-সময় মালদা আশ্রমের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। থাকা-খাওয়ার কষ্টও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তারই মধ্যে মহারাজের আন্তরিক, অমায়িক ব্যবহার সাধু-ব্রহ্মচারী, ভক্ত সকলকে আশ্রমজীবনের সাথে একাত্ম হতে সহায়তা করেছিল। এক যুবক সেই সময় সদ্য তার বাবাকে হারিয়েছে। নিজের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করলেও, সে পর্যন্ত তেমন সুবিধা করে উঠতে পারে নি। পারিবারিক অবস্থা তাই নানা দিক থেকে বিপর্যস্ত। এমনই এক বিপন্ন মুহূর্তে রামকৃষ্ণ মিশনের এক ভক্তের সাহায্যে সেই যুবকের পরিচয় হয় আশ্রম সম্পাদক পূজনীয় বাগীশানন্দজীর সঙ্গে। মহারাজের প্রাণখোলা ব্যবহার, সুমিষ্ট কথাবার্তা, মনজুড়ানো হাসি তাকে জীবনের সেই ঘন দুর্যোগের মধ্যেও যেন নতুন করে পথ চলার শক্তি দেয়। আশ্রমের মধ্যে যে আনন্দময় পরিবেশ নিজের সাধনজীবনের স্পর্শে তিনি তৈরী করতে বা ধরে রাখতে পেরেছিলেন, তারই ছোঁয়া পেয়েছিল সেই যুবক। মহারাজেরই নির্দেশে আশ্রমে শুরু হয়েছিল গীতার ক্লাস। সেখানে অংশ নেওয়ার সুযোগ এসেছিল তাই তার। অনেক পরে ২০১৮ সালে মহারাজ যখন মালদা আশ্রমে দীক্ষাদানের জন্যে গেছেন তখন মহারাজকে দর্শন করতে গেছে সে। প্রায় চার দশক পেরিয়ে এসে সে যুবক আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত। পারিবারিক জীবনের দুঃখকষ্টের প্রাথমিক ক্ষেত্র আগেই সে পেরিয়ে যেতে পেরেছিল মহারাজের আশীর্বাদে। ১৯৭৯তেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হতে পেরেছিল সে। ২০১৮-তে মালদা আশ্রমে মহারাজের কাছে যেতেই মহারাজ তাকে বলে ওঠেন, 'আচ্ছা তুই শিক্ষকতায় প্রথমে গাজোলে যোগদান করেছিলি না ?' কথাটা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিনের যুবক, আজকের প্রৌঢ়। প্রায় চার দশক আগের কথাও মহারাজ ধরে রেখেছেন তাঁর স্মৃতিতে। জীবনের দীর্ঘ সময় পেরিয়ে, আজো সেদিনের সেই যুবক গভীর কৃতজ্ঞতায় মনে করে মহারাজকে, তাঁর অপূর্ব সরল অথচ প্রাণশক্তিদায়ী জীবনচর্যাকে।

এই সময় ভাবপ্রচারের কাজে কাছে-দূরে নানা জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছেন মহারাজ। সিউড়ি, পূর্ণিয়া ইত্যাদি বহু আশ্রমে ঠাকুরের উৎসবে যোগদান করতেন, উৎসাহ দিতেন ভক্তদের। আশ্রমের উৎসবেও পল্লীগ্রামের ভক্তদের ছিল অবারিত দ্বার। কত সাধারণ, গরীব মানুষ এসে বসত তাঁর কাছে। অনর্গল বলে যেত তাদের জীবনের দুঃখদীর্ণ চলার পথের কাহিনি। মহারাজ

প্রশান্ত স্মিততায় শুনতেন তাদের কথা, তাদের সুখ-দুঃখের নানান্ অভিজ্ঞতা। কোন রাগ ছিল না, বিরক্তি ছিল না, শুধু প্রকাশ পেত অপরিসীম করুণা। তাঁর সেই করুণামাখা সদাশান্ত মূর্তিটি আজো সেখানকার প্রবীণ মানুষদের স্মৃতিপটে অনির্বাণ আলোর মত জেগে আছে। এই সময় মালদা অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই খুব বন্যা হত। মহারাজ নিজে উদ্যোগ নিয়ে এই বন্যাপীড়িত মানুষের ত্রাণের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সময়ে দেবীপুরে বিপুলায়তন ত্রাণকার্য সমাধা হয়েছিল। এছাড়াও কুমারগঞ্জ অঞ্চলেও ত্রাণকার্য পরিচালনা করা হয়। আশ্রমের অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলির প্রতিও তাঁর নজর ছিল। তাঁরই উৎসাহে আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্ররা একবার কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যান অবলম্বনে একটি নাটক পরিবেশন করে। নাটকটি যেমন অন্যদের প্রশংসা অর্জন করে, তেমনি মহারাজকেও খুব প্রীত করে। আশ্রমের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে পূজনীয় মহারাজের স্থির তৎপরতা ছিল দেখার মত। স্মরণীয় মালদা আশ্রমের সম্পাদকের পদ ছাড়ার পরেও ১৯৮৭ সালে মালদায় যে বন্যা হয়, তাতে তিনি ত্রাণকার্যের জন্যে এসেছিলেন এবং প্রায় টানা ২০-২৫ দিন ছিলেন। এই ত্রাণকার্যগুলিতে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পরিশ্রম আজো সেখানকার মানুষ মনে করেন বিনত শ্রদ্ধায়। শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে মহৎ আদর্শে নিজেকে উৎসর্গ করার ব্রতে একদিন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রবাহের এই অচঞ্চল ধারায়, তারই প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেছেন মালদার মানুষজন নিয়ত। আর মহারাজ থেকে গেছেন একই রকম নীরব, শান্ত, স্মিত, নিরাসক্ত।

১৯৮২-তে মহারাজ কাশীপুর মঠের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। কাশীপুর মঠের ভাবগম্ভীর পরিবেশকে ধরে রাখার জন্যে মহারাজের জীবন ছিল যেন সর্বোত্তম। তবে এই পর্বে বেশীদিন মহারাজের কাশীপুরে থাকা সম্ভব হয় নি। সঙ্ঘের নির্দেশে দুই বছরের সামান্য কিছু বেশী সময় অতিবাহিত করে, তাঁকে দায়িত্ব নিতে হয় রামকৃষ্ণ মঠ, কামারপুকুরের। ১৯৮৫-র জানুয়ারি মাসে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। এখানেও বেশীদিন অতিবাহিত করার সুযোগ হয় নি তাঁর। পুনরায় সঙ্ঘের নির্দেশে তিনি রওনা হন মহারাষ্ট্রের মুম্বাই শাখাকেন্দ্রের প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে ১৯৮৬-র এপ্রিল মাসে। নিরভিমানী পূজ্যপাদ মহারাজের মনে হয়েছিল যে সম্পূর্ণ অন্য ভাষা এবং অন্য সংস্কৃতির আবহে পরিচালিত এই শাখাকেন্দ্রে ঠাকুরের সেবাকাজে কতটা তিনি সফল হতে পারবেন ! কিন্তু পরবর্তী দীর্ঘ পঁচিশ বছর এই আশ্রমে তাঁর অবস্থিতি শুধু এই আশ্রম নয়, সমগ্র মহারাষ্ট্রেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র ও স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। যেসব সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাঁর সঙ্গে থেকেছেন এই পর্বে, যেসব ভক্ত ও সাধারণ মানুষ এসেছেন তাঁর কাছে এই দীর্ঘ সময়ের পথ ধরে, আজো তাঁরা সকলেই মুগ্ধ শ্রদ্ধায় পূজ্যপাদ মহারাজের এই কালপর্বের কর্মধারাকে, জীবনচর্চাকে মনে করেন, প্রেরণা লাভ করেন, এগিয়ে চলার সাহস অর্জন করেন।

নতুন ভাষার মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সেই পর্বে, নতুন সংস্কৃতির আবহের মধ্যে পড়েও পূজ্যপাদ মহারাজ কখনো অপ্রতিভ হন নি। যাঁরা সেই সময়ে তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা আজও স্মরণে আনেন যে কি অসামান্য স্বভাবসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ততায়, উচ্চকিত হাসির আবাহনে, উষ্ণ আন্তরিকতায় মহারাজ আশ্রমের সকলকে কাছে ডেকে নিতে পারতেন। ভাষা সেখানে বাধা হয় নি, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সেখানে কোন ব্যবধান তৈরী করে নি। তাঁর উপস্থিতি যেন আশ্রমে এক নিত্য উৎসবের তরঙ্গ উচ্ছলিত করে দিয়েছিল। মুম্বাই আশ্রমে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ১৫০তম বর্ষপূর্তি উৎসব আয়োজনের গুরুভার এসে পড়েছিল তাঁর কাঁধে। মুম্বাইয়ের খুব অল্প লোকের সঙ্গেই তাঁর তখন পরিচয় হয়েছিল। উৎসব আয়োজনের জন্যে প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের। মহারাজ তাঁর নিজস্ব কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই অনবদ্য কর্মকুশলতার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে বছর-ভরা নানা অসাধারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সেই উৎসব। মুম্বাইয়ের পুরাতন ভক্তরা এখনও মন-ভরা আনন্দে সেই দিনগুলিকে স্মরণে আনেন। পণ্ডিত ভীমসেন জোশী, কুমার গন্ধর্ব, পুরুষোত্তম জলোটা, সুধা মালহোত্রা প্রমুখরা অংশ নিয়েছিলেন সেইসব অনুষ্ঠানসমূহে। পরবর্তীকালেও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব, স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতামালার শতাব্দী জয়ন্তী ইত্যাদি খুব বড় মাপের নানা অনুষ্ঠান মহারাজজীর উদ্যোগে, নেতৃত্বে এই অঞ্চলে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। মুম্বাইবাসী ভক্তজনের হৃদয়ে সেই সব উৎসবের আনন্দঘন স্মৃতিমালা আজো অমলিন।

মহারাজের আগমনে মঠের আর্থিক দিক থেকেও উন্নতি হতে থাকে। যদিও তিনি নিজে থেকে যেচে কারুর কাছে অর্থ চান নি। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় যে কাজের জন্যে ভেবেছেন তার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ এসে পৌঁছে গেছে আশ্রমে। তাঁরই সময়ে হাসপাতাল বাড়িতে একটি নতুন তলা সংযোজিত হয়। নতুন কয়েকটি বিশেষ বিভাগও চালু হয়। সাধু নিবাসে পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজজীর জন্যে একটি ঘর, ভক্তদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ঘর, লিফ্ট ইত্যাদি তাঁর সময়েই নির্মিত এবং সংযোজিত হয়। তাঁরই উদ্যোগে একটি আশ্রম কার্যালয় বাড়ি এবং রাস্তার দিকে মুখ করে একটি নতুন বই বিক্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়। এছাড়াও সাকওয়ার গ্রামে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সূচিত হয় তাঁরই সময়ে। ওই অঞ্চলের জনজাতির মানুষদের চিকিৎসার জন্যে যে কেন্দ্রটি অতি সাধারণভাবে একদিন শুরু হয়েছিল, মহারাজের আগ্রহে এবং উৎসাহে সেটি একটি আদর্শ স্বাস্থ্য ও বহুমুখী কল্যাণকেন্দ্রের রূপ লাভ করে। তৈরী হয় প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যাকেন্দ্র, ছেলে-মেয়ে সবার জন্যেই কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাঠের কাজ শেখানোর বিভাগ, সেলাই শেখানোর বিভাগ, গোশালা ইত্যাদি। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এক্স-রে যন্ত্র বসানো হয়, প্যাথোলজি বিভাগ চালু হয়। স্মরণীয় এই জনজাতি গোষ্ঠীর

মানুষদের পার্থিব উন্নতির প্রযত্নেই পূজ্যপাদ মহারাজজীর যাবতীয় উদ্যোগ থেমে থাকে নি। এদের মধ্যে ঠাকুরের ভাব প্রচার করা, তাদের জীবনের আধ্যাত্মিক মানোন্নয়নের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা মহারাজ করে গেছেন সব সময়। তাই দেখা গেছে, এদেরই মধ্যেকার অনেক মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেছেন পূজ্যপাদ মহারাজজীর সময়েই। পরবর্তীকালেও এই ধারা অল্পবিস্তর বজায় থেকেছে।

মুম্বাই মঠে একজন ম্যানেজার মহারাজ থাকতেন পূজ্যপাদ মহারাজের কাজে সহায়তার জন্যে। একবার একজন সন্ন্যাসী মহারাজকে বেলুড় মঠ থেকে পাঠানো হয়েছে এই কাজের ভার দিয়ে। সেই সন্ন্যাসী যেদিন দায়িত্ব নিলেন, সেদিনই মহারাজ তাঁকে ডেকে বললেন, 'দেখো, এটা ঠাকুরের জায়গা, তোমার প্রথম কর্তব্য তাই মন্দিরে ঠাকুরের পূজা-ভোগাদি আমাদের ঐতিহ্য মেনে ঠিক ঠিক সম্পন্ন হচ্ছে কিনা, ঠিক সময়ে নিবেদনাদি করা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি দেখা। তোমার দ্বিতীয় কর্তব্য সাধু ভাইদের দিকে খেয়াল রাখা। মনে রেখো এখানে অনেক প্রবীণ ও বৃদ্ধ সাধু আছেন, তাঁদের যেন যত্ন-আত্তির ত্রুটি না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখো। তোমার তৃতীয় কর্তব্য ভক্তদের দেখা। ঠাকুর কৃপা করে তাঁদের এখানে নিয়ে আসছেন এবং তাঁরা তাই ঠাকুরের কাছে এসে পৌঁছাতে পারছেন। দেখবে এঁদের মধ্যে কত বিভিন্ন রকমের ভক্ত আছেন। তুমি তাঁদের সকলের সাথে ভদ্র ব্যবহার কোরো।' ঠাকুরসেবা, সাধুসেবা আর ভক্তসেবা – এই তিনটিই যে যেকোন আশ্রমের মূল কার্যধারা সেই ভাবনাটি সেদিন তিনি সাধু ভাইটির মনে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন। এর পরের দিনই তিনি আবার ঐ সাধুভাইটিকে ডাকেন এবং বলেন, 'দেখো এখানে ভক্তরা মঠে আসে যেকোন সময় এবং এসে একটু প্রসাদ পেতে চায়। কখনো কখনো দুপুরের প্রসাদের ঘণ্টার ঠিক আগে এসে পৌঁছায় এবং ঠিকঠাক খবরও দিয়ে আসতে পারে না। এরা যখন আমার কাছে আসবে, তখন তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে আমি হ্যাঁ বলবো না, তবে তুমিও কিন্তু কখনো না কোরো না, তুমি কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিও'। যে কেউই মঠে আসত, মহারাজ তাঁকে প্রথমে মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করে আসতে বলতেন, তারপরে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মিলত। আর যাঁরাই তাঁর সাথে দেখা করতেন, তাঁদের সকলকেই তিনি প্রসাদ নিয়ে যেতে বলতেন অথবা চা-ঘরে চা খেয়ে যেতে অনুরোধ করতেন। এভাবেই ভক্তসেবার আদর্শটিকে নিজের জীবনেও তিনি বাস্তবে রূপায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

মুম্বাই এমন একটা জায়গা যেখানে অনেক অসুস্থ মানুষ এসে পৌঁছাতেন ভারতের নানা প্রান্ত থেকে এমনকি বাংলাদেশ থেকেও। অনেক ক্যান্সার-আক্রান্ত মানুষেরাও আসতেন সেখানে। আশ্রমে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করতেন মহারাজ। অনেকেরই চিকিৎসা করাতে গিয়ে হয়ত সাময়িক হলেও টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যেত। মহারাজ অনেক সময় নিজের প্রণামী থেকে

তাদের আর্থিক সাহায্য করতেন। একবার দেখা গেল, একটি যুবক আশ্রম প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে খুব কাঁদছে। জনৈক সন্ন্যাসী সেটি দেখে, যুবকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে কোন সমস্যায় পড়েছে কিনা। যুবকটি তখন বলে যে, মহারাজের অপূর্ব হৃদয়বত্তা আর দয়ার দৃষ্টান্ত দেখেই সে আজ অভিভূত। যুবকটি এসেছিল মুম্বাইতে তার ক্যান্সার আক্রান্ত মায়ের চিকিৎসা করাতে। সেই চিকিৎসা করাতে গিয়ে তার সমস্ত অর্থ খরচ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় তখন মোবাইল ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি তৈরী হয় নি। ফলত তারা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল। মহারাজ ছেলেটির মুখ দেখেই বুঝতে পারেন যে, সে কোন সমস্যায় পড়েছে। মহারাজ নিজে তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করেন। তখন সে মহারাজকে পুরো ব্যাপারটি খুলে বলে। সব শুনে মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার টাকা তার হাতে তুলে দেন এবং তাকে বলেন যে ভবিষ্যতে আরো যদি লাগে, তাহলেও সে যেন নিঃসংকোচে মহারাজের কাছ থেকে তা চেয়ে নেয়। মহারাজের এই অপরিসীম করুণা ছেলেটিকে এবং তার সমস্ত পরিবারকে অভিভূত করে দিয়েছিল। এইরকম অনেক মানুষকেই মহারাজ অকাতরে সহায়তা দান করেছেন। গভীর সহানুভূতিতে এই সবক্ষেত্রে মহারাজকে অনেকেই বলতে শুনেছেন, 'ওদের রোগে মারছে আর অর্থে মারছে, আমরা কি একটু কিছু করতে পারি না ?'

যুবা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সমস্ত ভক্তদের কাছেই মহারাজ হয়ে উঠেছিলেন দেবদূতের মত। মুম্বাইতে এমন অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকতেন, যাদের ছেলেমেয়েরা থাকত বিদেশে। ফলত তাঁদের নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হত। আবার কর্মসূত্রে এমন অনেক অল্পবয়স্ক তরুণ-তরুণী মুম্বাইতে বসবাস করতেন, যাঁরা বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে দূরে থাকতে হত বলেই কিছুটা বাড়ির জন্যে মনোকষ্টে থাকতেন। মহারাজ এই দুই দল মানুষের কাছেই হয়ে উঠেছিলেন আশ্রয়স্বরূপ। তিনি অতি যত্ন নিয়ে তাঁদের খোঁজ-খবর রাখতেন। তাঁদের শারীরিক অবস্থা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে মহারাজ নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখতেন। দেখে মনে হত, মহারাজ যেন তাঁদের স্থানীয় অভিভাবক। প্রয়োজনে তাঁদের থাকার জায়গা খুঁজে পেতে মহারাজ সাহায্য করতেন। এঁদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে মহারাজ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। নিজে যদি না থাকতেন, বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতেন, তাহলে অন্য সাধুদের কাউকে-না-কাউকে ডেকে এইসব মানুষদের দেখা-শোনার ব্যবস্থা করতেন মহারাজ।

একবার একজন ভক্ত তাঁকে ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন যে তিনি এত অসুস্থ যে কোনভাবেই মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে মঠে আসতে পারছেন না। দুপুরবেলা মহারাজ জনৈক সাধুকে ফোন করে গাড়ী নিয়ে মহারাজের সঙ্গে ঐ ভক্তটির গৃহে যেতে বললেন। মহারাজ এবং অন্য সাধুটি বেলা ৩টে নাগাদ যখন ঐ ভক্তটির বাড়ী পৌঁছালেন, তখন সেই ভক্তটি একসাথে বিস্মিত ও অভিভূত। ভক্তটি আসতে পারছে না শুনে, মহারাজ

নিজে চলে এসেছেন ভক্তটির সাথে দেখা করতে। ভক্তটি যেন কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। এমনই ছিল মহারাজের করুণ-কোমল হৃদয়ের প্রকাশ। এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। অনেক সময়ই অনেক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখবার জন্যে মহারাজ নিজে বিভিন্ন হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছেন ঠাকুরের চরণামৃত ও প্রসাদী ফুল-মালা নিয়ে। অন্য সাধুদেরও এক্ষেত্রে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। অসুস্থ মানুষগুলি মহারাজের এই আসায় মনে যেন নতুন শক্তি পেত। ব্যাধির যন্ত্রণার মাঝে মহারাজের স্মিত অমায়িক হাসিমুখ তাদের মনে এনে দিত অপার্থিব শান্তি আর আশ্বাস।

মুম্বাইতে একজন বৃদ্ধা ভক্ত বাস করতেন। তাঁর মেয়ে সারদা মঠে সন্ন্যাসিনী হিসেবে যোগদান করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর ছেলেও অল্প বয়সে মারা যায়। তিনি নিজেও ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ফলত, বৃদ্ধা ভক্তটি একাই বাস করতেন। মহারাজ তাঁর চিকিৎসার জন্যে সমস্ত খরচ বহন করেছেন, তাঁর সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করেছেন। যখন সেই বৃদ্ধা ভক্তটি একদিন দেহরক্ষা করলেন, মহারাজ আশ্রমের সাধুদের নির্দেশ দিলেন তাঁর দাহকার্যের যাবতীয় ব্যবস্থা করতে। আরো একজন স্বামীহারা ভক্ত মহিলা সেখানে থাকতেন। তিনিও যখন একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, মহারাজ তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন আশ্রম থেকে। প্রায় এক সপ্তাহ টানা আশ্রম থেকে ঠাকুরের প্রসাদ তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হত। মহারাজ অনেক সময়ই অন্য সাধুদের বলতেন, 'দেখো, ওদের তো নিজের বলে ডাকবার এখানে কেউ নেই।'

একবার এক হোলির দিনে আশ্রমের সমস্ত কর্মীরা হোলির আনন্দে মেতে উঠেছে। ফলত আশ্রমের খাওয়ার ঘরে চা-ইত্যাদি দেওয়ারও কেউ নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন সন্ন্যাসী এটি দেখে চা-ঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মীটিকে ডেকে খুব বকাবকি করছেন। মহারাজ সেটি শুনলেন। পরে, ঐ সাধুকে ডেকে বললেন, 'দেখো, ওরা তো সবসময় কাজই করে যায়। মাঝে মাঝে কখনো কখনো ওদেরও তো একটু আনন্দ করার ইচ্ছা হয়। ওদের সেই সুযোগটা আমাদের কিন্তু দিতেই হবে। তোমরা কিন্তু ওদের সঙ্গে চাকর-বাকরের মত ব্যবহার কোরো না। ওরাও কিন্তু এখানে ঠাকুরের কাজ করছে, ওদের তাই এক পরিবারের, এক ঘরের ছেলেদের মতই দেখবে।'

মহারাজ যখন জাপানে গেলেন, তখন আশ্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধুকে মাসের প্রথমেই কিছু কাজ করে ফেলার নির্দেশ দিয়ে যান। সেই নির্দেশের মধ্যে ছিল কামারপুকুরের চারটি ঠিকানায় চারটি গরীব পরিবারকে কিছু অর্থ পাঠানোর নির্দেশ। যখন তিনি অতি অল্প সময়ের জন্যে কামারপুকুর মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন এই দরিদ্র পরিবারগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তখন থেকেই তিনি এদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। সেই সাহায্যের ধারাই বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঐ সন্ন্যাসী মহারাজকে। বস্তুত পরবর্তীকালেও এই সাহায্যের ধারায় ছেদ পড়ে নি কখনও।

একবার মুম্বাই আশ্রমের ম্যানেজার মহারাজ পূজনীয় বাগীশানন্দজীর কাছে এসে আশ্রমের সৌন্দর্যায়নের জন্যে কিছু অর্থব্যয়ের প্রস্তাব দেন। মহারাজ ধৈর্য সহকারে সমস্ত পরিকল্পনার কথা তাঁর কাছ থেকে শুনলেন। তারপরে বললেন যে, যদি আশ্রমের তহবিলে সত্যই কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে তা ব্যয় করতে হবে দরিদ্র মানুষের জন্যে নানা সেবাকার্যে। তা ব্যয় করা যেতে পারে হাসপাতালের পরিষেবা আরো ভাল করার জন্যে বা হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ কমানোর কাজে। সমস্ত কিছুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই তাঁর কাছে সুন্দর করে তোলার উপায়। তার জন্যে অতিরিক্ত অর্থব্যয় নিষ্প্রয়োজন। মুম্বাই মিশনের গ্রামীণ শাখায় নানারকম দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচিতে অর্থব্যয়ের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল প্রচুর।

মহারাজের সঙ্গে আশ্রমে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন এমন একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী জানিয়েছেন যে প্রচুর বাড়িঘর তৈরী করা, বা বড় বড় প্রকল্প নিয়ে আশ্রমের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে মহারাজের বিশেষ আগ্রহ ছিল না, সম্মতিও মিলত না। তিনি চাইতেন, যে কাজগুলি চলছে সেগুলি যেন আরো ভালো করে নিষ্পন্ন হয়। নিজে থেকে টাকা চাইতেন না কখনো ভক্তদের কাছে। সাধারণভাবে যে দান আসত আশ্রমে, তাতেই ঠাকুরের সংসার চলে যাবে, এমন ভাব বিরাজ করত তাঁর অন্তরে এবং আচরণে। এমনকি অনেক সময় খুব বড় মাপের দান গ্রহণেও অনীহা থাকত তাঁর, কারণ তাহলে দানের জন্যে নির্দিষ্ট শর্তপালনের ভারও যে পড়ে যায় গ্রহীতার কাছে। একবার আশ্রমের মূল কার্যালয়ে কর্মরত সন্ন্যাসী তাঁকে জানান যে, একজন ভক্ত একটু বেশী পরিমাণ অর্থ দান করতে চাইছেন আশ্রমের একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্যে। মহারাজ কিন্তু কিছুতেই সেই অর্থ নিতে চাইলেন না। বারবার অনুরোধ আসা সত্ত্বেও জানালেন যে, ঐ অর্থ ছাড়াই তো আশ্রমের উক্ত কার্যধারা চলেছে যথানিয়মে, সেখানে তো কোন ব্যত্যয় হয় নি। তাছাড়া ঐ অর্থ নিলে আবার নতুন দায়বদ্ধতাও এসে যাবে আশ্রমের উপরে। সুতরাং অযথা এই চাপ আশ্রমের উপর না নিলেই আশ্রম ও সাধুদের পক্ষে ভালো হবে।

১৯৯০ সালে মুম্বাইয়ের ভয়ানক পরিস্থিতির সময়ে একদিন দুপুর বেলা মহারাজের কাছে একটি ফোন আসে একটি অত্যন্ত দুর্গত অঞ্চল থেকে। খবর আসে যে সেই অঞ্চলের কয়েক শত নর-নারী-শিশু উক্ত পরিস্থিতির কারণে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। মহারাজের কাছে অনুরোধ আসে যে যদি রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে তাঁদের জন্যে কিছু ত্রাণ কার্য করা সম্ভব হয়। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে জনৈক ভক্ত এবং কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে সেই অঞ্চলে পাঠান এবং অনেক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এই ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। মহারাজের অসামান্য ব্যক্তিত্বের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল তখন সমগ্র মহারাষ্ট্রের নানান অঞ্চলে। তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রী পি সি আলেকজাণ্ডার মহারাজজীকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। রাজভবনের বহু

অনুষ্ঠানে মহারাজকে তিনি সাদরে আমন্ত্রণ করতেন। নিজেও একাধিকবার খার আশ্রমে এসেছেন, অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রে ঠাকুরের ভাবপ্রচারের কাজেও পূজ্যপাদ মহারাজজীর অনন্য অবদানের কথা অনেকেই বিনম্র শ্রদ্ধায় আজো স্মরণ করেন। মহারাষ্ট্র ভাবপ্রচার পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর নির্দেশাবলী এই পরিষদকে অনেক কাজে অগ্রণী করেছে, নিয়মনিষ্ঠ করেছে। তাঁর সঙ্গে ভাবপ্রচার পরিষদের কাজ যাঁরা করেছেন তাঁরা আজো তাঁর কর্মপদ্ধতির প্রতি বিরাট শ্রদ্ধাশীল। যদিও তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট, তবুও প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী ভৌমানন্দজীকে তিনি সবসময়ই এই জাতীয় পরিষদের আলোচনায় সামনে এগিয়ে দিতেন। তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু ভীতির ভাব ছিল না, ফলত সকলেই তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজে নিজের কথাগুলি বলতে পারতেন। আশ্রমগুলির পরিচালন সংক্রান্ত নানা সমস্যাবলী নিয়ে সহজে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন সবাই, মন খুলে সেই সব আলোচনা তিনি শুনতেন এবং চেষ্টা করতেন তাঁদের সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দিতে। পরিষদের আর্থিক সংকটের কালে তিনি পরিষদকে আড়াই লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। বস্তুত এই অর্থ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় নাম-নথিভুক্তিকরণের দেয় অর্থ থেকে। তাঁরই উদ্যোগে তিনদিন ধরে মহারাষ্ট্রের সমস্ত ভক্তদের নিয়ে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক শিবির আয়োজিত হয়। হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীর থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন মহারাজ। যখন তিনি কাশীপুর চলে আসবেন বলে ঠিক হয়ে গেছে, তখনই মহারাষ্ট্র ভাবপ্রচার পরিষদের অর্ধ বার্ষিক সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। প্রথমে মহারাজেরই সেখানে থাকার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছিল না, কারণ তিনি জানিয়ে দেন যে যেহেতু তাঁকে চলে যেতে হবে, তাই এর মধ্যে আবার সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে গেলে, সেটি তাঁর পক্ষে খুব ক্লান্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ভাবপ্রচার পরিষদের কর্মকর্তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ শেষ পর্যন্ত মহারাজ ফেলতে পারলেন না এবং সেই অনুষ্ঠানে নিজের অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও অংশ নিলেন। ভাবপ্রচার পরিষদের সকলেই মহারাজের এই অদ্ভুত আত্মত্যাগে, নিরভিমানিতায় আর ঠাকুরের ভাবপ্রচারের কাজে অনলসতায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

মুম্বাই আশ্রমে থাকাকালীনই পূজ্যপাদ মহারাজ ১৯৯০-এর ৮-ই মার্চ তারিখে রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাস্টী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর মুম্বাইতে কাটানোর পর পূজ্যপাদ মহারাজের কাছে আবার আহ্বান এসে পৌঁছায় অন্যত্র যাওয়ার। বেলুড় মঠের নির্দেশে এই পরিণত বয়সেও মহারাজ আবারো নতুন আশ্রমের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। ২০১০-এর ২৭-এ মে রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুরের অধ্যক্ষ হিসেবে দ্বিতীয় বার কার্যভার গ্রহণ করেন মহারাজ। পিছনে পড়ে থাকে মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে মহারাজের যাপিত সিকি শতাব্দীর এক অনন্য জীবন। কর্মে-সাধনায়

পবিত্র সে জীবনের আখ্যান কত প্রাণে শান্তি এনে দিয়েছে, কত আতুর মানুষের কষ্টের মধ্যেও প্রীতির দ্বার অপাবৃত করেছে। এই পঁচিশ বছরের সময়যাত্রায় এই অঞ্চলের মানুষের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ এক প্রতিষ্ঠান। তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা কাছে ডেকে এনেছিল তাঁদের, তাঁর প্রাণখোলা হাসি ভগবানের বিরাট সংসারে নিঃস্বার্থ প্রেমের অনাসক্ত বন্ধনে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল এঁদের সবাইকে চিরতরে।

২০১০-এ কাশীপুরে অধ্যক্ষের কার্যভার নিয়ে মহারাজ শুরু করলেন তাঁর জীবনের এক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর কিছুদিন পরেই ২০১১-র ৭-ই জুলাই মহারাজ আধ্যাত্মিক জীবনাগ্রহীদের মন্ত্রদীক্ষা দেবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ। ২০১৪-র জুন মাস থেকে মহারাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ পদে বৃত হন। ২০১১-র ৮ নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পূজার দিন কাশীপুরে মোট ৩১ জনকে পূজ্যপাদ মহারাজ প্রথম মন্ত্রদীক্ষা দান করেন। এই দীক্ষাদান পর্ব চলেছে টানা আট বছরের বেশী সময় ধরে। শেষ বারের জন্যে তিনি দীক্ষা দান করেন ২০২০ সালের ১৫-ই মার্চ তারিখে সিঁথির রামকৃষ্ণ মঠে তথা বেণী পালের বাগানবাড়িস্থিত শাখাকেন্দ্রে। তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছেন সর্বমোট ৫০৮৮৫ জন। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্রে পূজ্যপাদ মহারাজ ভক্ত জিজ্ঞাসুদের কাছে হয়ে উঠেছেন আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শক ও আশ্রয়দাতা। কেরালা, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা, আন্দামান, মেঘালয়, দিল্লি, বিহার, ঝাড়খণ্ড, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে কেবল মন্ত্রদীক্ষাদানের জন্যেই পৌঁছে গিয়েছিলেন মহারাজ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র ছাড়াও অনেক ভাবপ্রচার পরিষদের পরিচালনাধীন আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা দিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে বিলাসপুর, ধুবড়ি, আলিপুরদুয়ার, লামডিং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে কয়েকটি আবার পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিলচরে চা-বাগানের শ্রমিকরাও তাঁর কৃপা লাভ করেছে। কামারপুকুর মঠে জনজাতি গোষ্ঠীর ১২-১৪ জনকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেছিলেন মহারাজ। এঁদের মন্ত্রদীক্ষা দানের শেষে মহারাজ খুব তৃপ্তি পেয়েছিলেন, মন্তব্য করেছিলেন, 'এদের খুব ভালো প্রিপারেশান ছিল।' কয়েকজনকে কাশীপুরে মায়ের ঘরে আলাদা ভাবে এক-একজন করে মন্ত্রদীক্ষা দান করেছেন মহারাজ। কিন্তু এসবের ক্ষেত্রে মহারাজ নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন। এঁদের মধ্যে একজন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানও করেছে সাধুজীবন যাপনের আশায়। সাধারণত বারো বছরের নীচে কাউকে দীক্ষা দান করতেন না মহারাজ। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে নিজে দেখে-শুনে এর ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন এবং নয় বছরের দুই বালিকাকে দুটি স্থানে দীক্ষাদানে কৃপা করেছিলেন তিনি। মন্ত্রদীক্ষাদানের সময় কোনরকম দ্রুততা পছন্দ ছিল না তাঁর। যতক্ষণ না পর্যন্ত মন্ত্র-উচ্চারণ সহ সমস্ত কিছু যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মহারাজ কাউকে ছাড়তেন না।

এই পর্বে মহারাজের জীবনচর্যার মধ্যে গুরুশক্তির অনন্য অভিজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। একদিন সারদাপীঠের ভূমিতলে বেলুড় মঠের সান্নিধ্যে থেকে যে অপূর্ব জীবনের সূচনা হয়েছিল, এই পর্বে সেই জীবনই নানা পুষ্পে-পল্লবে সুসজ্জিত-সুরভিত হয়ে উঠেছে। পূজ্যপাদ মহারাজের এই দীর্ঘ জীবনসাধনা তৈরী করেছে এমন কিছু মানদণ্ড, যা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধনপ্রবাহের ইতিকথায় চিরকাল অনিভন্ত দ্যুতি নিয়ে বিরাজ করবে। তাঁর শান্ত, নীরব জীবনযাপনের নানান জ্যোতিছটা সাধু-ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্ত, কর্মী, সরকারী বা বেসরকারী আধিকারিক, পণ্ডিত-মূর্খ সকলকেই আলোকিত করেছে, এক দিব্য পাবনশক্তিতে প্লাবিত করেছে। যাঁরা তাঁর কাছে এসেছেন, তাঁরাই সেই ব্যক্তিত্বের আভায়-প্রভায় আজো বিস্মিত, মুগ্ধ, কৃতার্থ।

যাঁরাই তাঁর সাথে কাজ করেছেন, তাঁরাই স্বীকার করেছেন কে কোন্ কাজ করতে পারে সে বিষয়ে একটি চমৎকার ধারণা দ্রুত তৈরী করে নিতে পারতেন তিনি। যেসব সাধুরা তাঁর সাথে দিনযাপন করেছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে কাজের ক্ষেত্রে কখনো অযথা হস্তক্ষেপ করে কর্মীর স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করতেন না মহারাজ। সকলকে বিশ্বাস করতেন গভীরভাবে। তাঁদের কাজ করতে দিয়ে শুধু মনে করাতেন যে তাঁরা ঠাকুরের কাজই করছে। এই স্বাধীনতা দিয়েও যথেষ্ট তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন প্রত্যেকের উপর। আশ্রমের প্রতিটি কাজ তাঁকে জানিয়ে করতে হত। প্রতিটি কাজের মধ্যেকার খুঁটিনাটিগুলির উপরেও দৃষ্টি এড়াতো না তাঁর। এটিই ছিল তাঁর নেতৃত্ব গুণ। স্বাধীন চিন্তার বিকাশের মাধ্যমে সকলে তাদের নিজেদের মত করে নিজেদের সৃজনীশক্তিকে প্রতিষ্ঠা দিক, কেবল তাঁদের মূল লক্ষ্য যেন ঠাকুর থেকে বিচ্যুত না হয় – এই ভাবটিই ছিল মহারাজের যাবতীয় কর্মপরিচালনার মূল সূত্র। নিজের চিন্তাভাবনাও ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং কোন সময় সেখানে সময় নষ্টের অবসরই থাকত না। কাজে কেউ ভুল করলেও মহারাজ তাঁর ভুলটি শুধরে দিতেন, তাঁকে শুধু বলতেন যে পরবর্তী ক্ষেত্রে সজাগ হয়ে কাজ করতে। কোন সফলতা-ব্যর্থতার মাপকাঠিতে বিচার করেন নি কোন কাজকে। সাধনার অঙ্গ হিসেবে নিয়েছেন সমস্ত কিছু। তাই সকলকেই বলতেন যেন বিফলতার হতাশা অথবা সফলতার উচ্ছ্বাস কোন কিছুই জীবনে প্রভাব না ফেলে। রামানুজাচার্য সাধকের জীবনে অনুদ্ধর্ষ আর অনবসাদ রূপ যেদুটি অপরিহার্য সাধনের কথা বলেছেন, মহারাজ তাঁর কায়-মনো-বাক্যে সেদুটিকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন। অন্যেরাও তারই প্রেরণার সুবাতাস অনুভব করেছে নিজেদের জীবনেও।

সাধুজীবন গঠন ও সাধুজীবন যাপন তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। নিজের জীবনপ্রভাতে যে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তিনি, উত্তরসাধকদের জীবনেও সে প্রেরণার সুধাপাত্র এগিয়ে দিয়েছেন কুণ্ঠাহীনভাবে, সতর্ক প্রযত্নে। আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীরা সকালের মঙ্গলারতিতে যাচ্ছে কিনা,

সন্ধ্যারতিতে যাচ্ছে কিনা এসব বিষয়ে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতেন মহারাজ। নিয়মিত জপধ্যানের অভ্যাসও যাতে সাধুজীবনে গড়ে ওঠে এ বিষয়েও তিনি ছিলেন আপোসহীন। অনেক পরিণত বয়সে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ভোরের মঙ্গলারতিতে যাওয়ার অভ্যাস ধরে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর পায়ের বা অন্যান্য শারীরিক অবস্থার কথা বলে সেবকরা যখন তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছে, মহারাজ শোনেন নি, অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর এই নিয়ম বজায় রেখেছিলেন। সন্ধ্যারতিতে যাওয়া তো তাঁর কাছে ছিল বাধ্যতামূলক। আরতিতে উপস্থিত থাকার জন্যে মন্দিরে পৌঁছে যেতেন ৩০ থেকে ৪০ মিনিট আগে। শান্তভাবে বসে থাকতেন ঠাকুরের ছবির দিকে দৃষ্টি রেখে। ধুনো দিতে একটু দেরী হলেই ডাক পড়ত পূজারীর। একবার মুম্বাই আশ্রমে একজন সাধুভাই কোন কারণে সকাল ও সন্ধ্যায় আরতিতে যেতে পারেন নি পরপর কয়েকদিন। মহারাজের নজর এড়ায় নি এই ঘটনা। আশ্রমেরই আর একজন তুলনায় প্রবীণ সাধুকে ডেকে বললেন, 'তোমার একজন ভাই যে এসব করতে পারছে না, এসব ব্যাপারে তুমি তাকে কিছু বলছ না কেন, সব কি অধ্যক্ষ মহারাজ বলবেন, তোমরাও দেখবে, বলবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্ঘে সেজন্যেই তো একসঙ্গে থাকা। একে অপরকে দেখবে, তবেই তো সকলের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে।' মঠজীবন কেমনভাবে যাপন করতে হয়, নিজের জীবন দিয়ে প্রতি মুহূর্তে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন মহারাজ। শুধু মন্দির নয়, খাবার ঘরে দেরী করাও ছিল তার অপছন্দ। সকল সাধু-ব্রহ্মচারী ঠিক সময়ে ডাইনিং হলে আসবে এবং একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে এটি ছিল মহারাজের এক আন্তরিক অভিপ্রায়। কাশীপুরে কোন একজন সাধু একটু বেশী শারীরিক কৃচ্ছ্রতা করতে চাইছে। মাঝে মাঝেই তাকে তাই খাওয়ার ঘরে দেখা যাচ্ছে না। মহারাজও যথারীতি নিত্য খোঁজ করেন তাঁর। একদিন তারপর তাঁকে প্রায় জোর করে এনে নিজের সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন। সে যখন খাচ্ছে, মহারাজ অপূর্ব আন্তরিকতায় তাঁকে বলছেন, 'এই দেখো তুমি খাচ্ছো, আমাদের কত আনন্দ হচ্ছে !' মঠজীবনে মিতবাক হওয়ার প্রয়োজন আছে। ভক্তরা আসবেন মঠে, কিন্তু সাধুরা প্রয়োজনের বেশী কথা বলে সময় নষ্ট করবে না। এই বিষয়টিকে বারেবারে আশ্রমের সাধুভাইদের মনের মধ্যে তিনি গেঁথে দিয়ে যেতেন। ভক্ত-মায়েদের সঙ্গেও সাধুদের মেলামেশার ব্যাপারে বেশ সতর্ক নজর রাখতেন মহারাজ। কোথাও যেন প্রগল্‌ভতা প্রকাশ না পায়। সাধুজীবনের এক মহৎ উচ্চতা রয়েছে। সাধুকে তা সচেতন তপস্যায় ধরে রাখতে হবে। এই ছিল মহারাজের স্পষ্ট নির্দেশ। কতবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সবাইকে যে ঠাকুরের সঙ্ঘে তপস্যা বলতে অতিরিক্ত কিছু করা নয়, ঠাকুরের আদর্শে একটি সুন্দর সাধুজীবন যাপন করা, একটি নিয়মনিষ্ঠ আশ্রমজীবনের অংশীদার হওয়া। তাঁর মতে এভাবে সারাজীবন কাটাতে পারলেই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমার কৃপা অবশ্যই একদিন এসে পড়বে সাধকের জীবনে।

একটি আদর্শ আশ্রমজীবন তথা মঠ-পরিবেশ তৈরীর প্রতিও তাঁর লক্ষ্য ছিল নিত্য জাগরূক। আশ্রমের কেন্দ্রে বিরাজ করেন ঠাকুর-মা-স্বামীজী মহারাজ। তাঁদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে হবে সাধু-ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ভক্ত, স্বেচ্ছাসেবক সকলের জীবন। সকলকেই তাই ঠাকুরের অভিমুখী করে তোলা ছিল তাঁর লক্ষ্য। গুরুশক্তির অমোঘ বিকাশে তাই পূজ্যপাদ মহারাজজী অগণিত মানুষের মনে এনে দিয়েছেন শান্তি, জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যের প্রতি এগিয়ে যাওয়ার গভীর অভীপ্সা। তাঁর সমগ্র জীবনটি হয়ে উঠেছিল এই আশ্রমকেন্দ্রিকতার, এই মঠ-আবহের মূর্ত প্রকাশ। তুলনায় নবীন এক সন্ন্যাসী যিনি একসময় তাঁর সঙ্গে সাধুকর্মী হিসেবে দীর্ঘকাল একটি আশ্রমে কাজ করেছেন, সঙ্ঘের নির্দেশে একটি কেন্দ্রের প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে রওনা দেবেন। যাওয়ার আগে পূজ্যপাদ মহারাজের কাছে গেছেন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে। তিনি জোর করে তাঁকে কয়েকদিন সেখানে থেকে যাওয়ার কথা বললেন। তারপর সন্ধ্যাবেলায় যখন মহারাজ নিজে আশ্রমপ্রাঙ্গণে হাঁটছেন, তখন হঠাৎ এই সন্ন্যাসীটিকে ডেকে নিলেন নিজের কাছে। তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলেন ঠাকুরের মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে। তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, 'দেখো, কখনো ভাববে না তুমি প্রধান। সব সময়ে চিন্তা করবে যে তুমি ঠাকুরের সেবক। প্রতিদিন তুমি যখন ঠাকুরঘরে যাবে, তখন ঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁকে বলবে ঠাকুর মনে-প্রাণে তোমার সেবা করিয়ে নিও।' তাঁকে নিজের শরীরের সুস্থতার জন্যেই নিতে হত স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ। জনৈক সাধু তাঁর এত স্টেরয়েড ওষুধ নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানান এবং বলেন যে এই রকমের ওষুধগুলির নানারকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। সুতরাং এগুলি এত নিয়মিত এবং এত বেশী পরিমাণে না নেওয়াই ভালো। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের দৃপ্ত উত্তর, 'যদি আমি এই স্টেরয়েডগুলি না নিই, তাহলে যে আমি সক্রিয় থেকে ঠাকুরের সেবা করতে পারব না। আমি কোনভাবেই নিজে স্বার্থপরের মত শরীরের চিন্তা করে কাটাতে পারব না। আমাকে সঙ্ঘরূপী ঠাকুরের সেবায় এভাবেই প্রয়োজনে যতদিন সম্ভব সক্রিয় থাকতে হবে।' রামকৃষ্ণ-শরীররূপী সঙ্ঘের প্রতি কি অপরিসীম দায়বদ্ধতা। নিজেকে সেই মহাসঙ্ঘের কাজে বলিদানের কি বলিষ্ঠ ব্যাকুলতা। এই দায় কাঁধে নিয়েই না তিনি বহন করে গেছেন দশকের পর দশক ধরে মঠ-জীবনের এক উচ্চ পবিত্র ঐতিহ্যকে, এই আত্মত্যাগের আর্তিতেই না তিনি নির্মাণ করে গেছেন আদর্শ আশ্রমজীবনের পরাকাষ্ঠা।

এক অনাড়ম্বর, সরল-সহজ জীবনের অনুপম দৃষ্টান্ত তিনি। তাঁর জীবনগভীরতার অনেকটাই হঠাৎ করে বোঝা সম্ভব হত না। নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। কথা বলতেন কম। আচরণে কোন বিশিষ্টতার ধারক-বাহক ছিলেন না কোনদিন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী জানাচ্ছেন যে, যখন তিনি তুলনায় নবীন সন্ন্যাসী তখন একবার আলং শাখাকেন্দ্র থেকে এসেছেন মঠে। সেই সময় এই শাখাকেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন এই প্রবীণ সন্ন্যাসী মহারাজ।

পূজনীয় বাগীশানন্দজী তখনই মঠের অন্যতম ট্রাস্টী। বাগীশানন্দজী সেদিন মঠের সাধুনিবাসের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। পরনে একটি গেঞ্জি। দেখে একবারেই বোঝা যাবে না যে, তিনি এত প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং সঙ্ঘের একজন অছি। বাগীশানন্দজীর দিকে অনেকক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন এই সন্ন্যাসী। কিছু বলার সাহসও পাচ্ছেন না স্বভাবলাজুকতার কারণে। তাঁকে অনেকক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে পূজ্যপাদ বাগীশানন্দজী বলে উঠলেন, 'তাকিয়ে আছো ? কিছু বলবে ?' সন্ন্যাসী তবু কিছু বলতে পারছেন না। মহারাজ নিজে থেকেই তাঁর সংকোচ ভেঙে কাছে ডেকে নিলেন, 'এসো চা খাবে।' একসাথে তাঁকে নিয়ে চায়ের আসরে বসলেন। যত্ন করে চা খাওয়ালেন। মুহূর্তে তাঁর জড়তা সরিয়ে ভালবাসায়, সহজ আন্তরিকতায় আপন করে নিলেন তাঁকে। এমনই ছিল মহারাজের ব্যবহার। পরবর্তীকালে মুম্বাই আশ্রমে বা কাশীপুরে থাকার সময় একাধিকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পূজ্যপাদ মহারাজ এই সন্ন্যাসীকে। আজো গভীর আবেগ ও কৃতজ্ঞতায় মহারাজের সেই প্রীতিময় আমন্ত্রণের কথা স্মরণ করেন তিনি, স্মরণ করেন পূজ্যপাদ মহারাজের সরল অকপট ভালোবাসার মাধুর্যভরা মূর্তিটিকে।

সময় মেনে চলা, নিয়মকে সম্মান করে জীবনযাপন করাটা ছিল মহারাজের জীবনের একান্ত ভাবগত বৈশিষ্ট্য। যাঁরা তাঁর সঙ্গে থেকে কাজ করেছেন, তাঁরা সকলেই এই দিকটিকে লক্ষ্য করেছেন এবং প্রাণিত হয়েছেন। মুম্বাই আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল সাধুকর্মী হিসেবে ছিলেন এমন একজন সন্ন্যাসী জানাচ্ছেন যে, অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে যেকোন জায়গায় যাওয়ার জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিতে পারার এক অপূর্ব দক্ষতা ছিল মহারাজের মধ্যে। যেকোন কাজে নিজে সবার আগে উপস্থিত হতেন। কোন আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকার কথা থাকলে সময়ের আগে পৌঁছে যাবেন সেখানে। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরু উৎসবের সময় তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁরাই গেছেন আলোচনা করতে ধর্মসভায়, তাঁরা সকলেই লক্ষ্য করেছেন, মহারাজ সবার আগে প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। শুধু তাই নয়, প্রতিদিনের ধর্মসভায় নিজে মঞ্চে বসে থাকতেন সারাক্ষণ। শুনতেন অত্যন্ত সজাগভাবে কে কী বলছে। তারপর বলা শেষে সকলকেই উৎসাহসূচক বাক্য বলে প্রশংসা করতেন। নিজে নিয়ে যেতেন খাবার ঘরে। একসঙ্গে বসিয়ে চা-ফল ইত্যাদি খাওয়াতেন। অথচ প্রত্যেকটি চলত একেবারে নিয়ম করে, নিষ্ঠাভরে। জীবনের শেষ পর্যায় অবধি এই নিয়মনিষ্ঠার ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায় নি তাঁর মধ্যে। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হিসেবেও পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই সময়ানুবর্তিতার দিকটি উল্লেখ করার মত। সকালে নির্দিষ্ট সময়ে শয্যাত্যাগ করে, ভগবানের নাম-জপাদি করে প্রতিদিন পড়তেন গীতা, কথামৃত ও দেববাণী। চা-টিফিন খাওয়া ইত্যাদি সম্পন্ন হয়ে যেত তাঁর প্রতিদিন সকাল ৯টা ৪৫-এর মধ্যে। তারপর ১০টা থেকে চলত ভক্তদের সাথে সাক্ষাৎ ও প্রণামের পর্ব। ১১টা অবধি মোটামুতি চলত এই প্রণাম ও সাক্ষাতের পালা। তারপর চিঠিপত্র পড়ে তার

উত্তর দিয়ে চলে যেতেন নিজের ঘরে। আবার স্নানাদি করে এসে ঠিক সময়ে প্রসাদের জন্য পৌঁছে যেতেন ডাইনিং হলে। অনেক সময় প্রসাদ পাওয়ার পরে যদি কোন মায়েরা থাকতেন তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে, তাহলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে নিতেন। এরপর আশ্রম থেকে সমস্ত ভক্তরা চলে যাওয়ার পর ঢুকতেন নিজের ঘরে। এরপর কিছুক্ষণ চলত বই পড়া। তারপর একটু বিশ্রাম করে বিকেল চারটের সময় আবার বসতেন ভক্তদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পালা চলত এই সময়। এরপর চলে যেতেন সন্ধ্যারতির জন্যে ঠাকুর ঘরে। সেখানে সাধু-ব্রহ্মচারী, ভক্তরা সবাই উপস্থিত হচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে সতর্ক নজর ছিল মহারাজের। সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরে এসে কিছুক্ষণ বসে রাতের প্রসাদাদি সামান্যই গ্রহণ করতেন। সমস্তটাই হত যেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

এমনই এক প্রকৃতিতে গম্ভীর, আপাত রাশভারী মানুষটির মধ্যে নিত্য জেগে থাকত রসিক চিত্ত। সহজ ভঙ্গিমায় মজা করার একটা স্বতঃস্ফূর্ততা সবাই লক্ষ্য করেছে তাঁর কাছে থেকে। একবার বেলুড় মঠ একজন সন্ন্যাসীকে কাছেরই এক শাখাকেন্দ্র থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে পাঠাচ্ছেন। বেলুড় মঠ থেকে খবর পেয়েই পূজ্যপাদ মহারাজ ঐ আশ্রমের সম্পাদক মহারাজকে ফোনে জানান যে উক্ত সন্ন্যাসীকে ঐদিনই যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্রমের সম্পাদক মহারাজ জানালেন যে, আর একজন সন্ন্যাসীকে এই সন্ন্যাসী নিজের কাজগুলি বুঝিয়ে দিয়ে ৭ দিনের মধ্যেই চলে আসবে। পূজ্যপাদ মহারাজ কিন্তু নাছোড়, এখনই ছেড়ে আসতে হবে। মহারাজের যুক্তি, কাছেই তো থাকবে, সুতরাং প্রতিদিন গিয়ে বুঝিয়ে এলেই হলো। অবশেষে মহারাজের সরল, অকপট স্নেহপূর্ণ আবদারের কাছে হার মানলেন ওই আশ্রমের সম্পাদক মহারাজ। বিকেলে উক্ত সন্ন্যাসী কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যেই কাশীপুর উদ্যানবাটিতে উপস্থিত হয়েছেন, মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছেন, মহারাজ মুচকি হেসে বলছেন, 'কি তুমি চলে এসেছো তো ? বুঝলে ২৫ বছর ধরে মোহান্তগিরি করছি, জমি আগে দখল করে নিতে হয়। আর কিছু না শিখি, এটা কিন্তু শিখে নিয়েছি।' বলেই মহারাজ নিজেও হেসে উঠলেন, উপস্থিত সকলেও মহারাজের অমলিন রসিকতার আনন্দ উপভোগ করতে লাগল।

একবার তাঁর জন্যে চিংড়ি মাছের মালাইকারি করা হয়েছে। উপস্থিত সবার জন্যেই করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর এক সেবকের চিংড়িমাছ খেলে এলার্জি হত, তাই তার জন্যে ডিমের কারি করা হয়েছে। সবাই খাচ্ছে। মহারাজকে চিংড়ি মাছের মালাইকারিও দেওয়া হয়েছে, আবার ডিমের কারিও দেওয়া হয়েছে। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার ডিমের কারি আবার কেন ?' তখন একজন সেবক জানালেন, 'আসলে অমুকের তো চিংড়ি মাছে এলার্জি আছে, তাই ডিমের কারি করা হয়েছে।' মহারাজ শুনে সঙ্গে

সঙ্গে মুচকি হেসে ঐ সেবককে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'বাঃ দেখো তো, তোমার এলার্জি হবে, তাই তোমার জন্যে ডিম আনা হলো, আর আমি দুটোই পেয়ে গেলাম। লাভটা কিন্তু আমারই।' খেতে যে খুব ভালোবাসতেন তা নয়, খাওয়ার পরিমাণও ছিল খুব কম। খাওয়ার মধ্যে আইসক্রিম তাঁর পছন্দের তালিকায় ছিল। কিন্তু অন্যকে খাওয়াতে তাঁর জুড়ি ছিল না। বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার পরে যখন পূজারী-তন্ত্রধারকেরা তাঁকে প্রণাম করতে যেতেন, তখন আশ্রমে তাদের টিফিন খেতে হত। সেই এলাহি খাওয়ার সময় মহারাজ নিজেই বসে থাকতেন পুরোটা সময়। প্রত্যেকে প্রতিটি জিনিস খাচ্ছে কিনা নজর রাখতেন। প্রায় জোর করে প্রতিটি জিনিসই তাদের খেতে বলতেন। তার সেই ভালোবাসার কথা কেউই আজো ভুলতে পারে না।

মহারাজের এই রসিক মনটি শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। মহারাজ সাধারণভাবে কিছুতেই বক্তৃতা দিতে চাইতেন না। শেষবার যখন চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, তারই মধ্যে একদিন বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। পূজ্যপাদ মহারাজের সচিব-সেবক মহারাজকে জানালেন সেদিনের অনুষ্ঠানের বিবরণ। এও জানালেন যে, সেদিনের অনুষ্ঠানে পরম পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজজী আসেন নি, সেইজন্য সেই সভায় সেদিন উপস্থিত থাকা প্রবীণ সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ সভাপতির ভাষণ দিয়েছেন। এই খবর শুনেই মহারাজের সেই সরস উক্তি, 'দেখেছো, ভাগ্যিস আমি ছিলাম না, নাহলে আমাকেই বলতে বলতো।'

আর একবার তাঁর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মাকে দর্শনের ইচ্ছা হয়েছে। কাছের আশ্রমের এক করিৎকর্মা তরুণ সন্ন্যাসীকে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তুলে নিলেন গাড়িতে, কারণ জানতেন ওই সন্ন্যাসীর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সেবায়েতদের সঙ্গে কিছু পরিচয় আছে। ওই সন্ন্যাসী মহারাজও যথাসাধ্য ঐটুকু সময়ের মধ্যে পূজ্যপাদ মহারাজের জন্যে সুন্দর দর্শনের ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে দিলেন। মহারাজও মন ভরে দর্শনাদি করে খুব তৃপ্ত হলেন। দর্শনাদির পর ওই সন্ন্যাসিটির খুব প্রশংসা করতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, 'বাঃ তুমি তো একেবারে ভি আই পি-দের মত দর্শনের ব্যবস্থা করে দিয়েছো।'

আশ্রমের পাখিদের খুব ভালোবাসতেন মহারাজ। নিজের হাতে পাখিদের খাওয়াতেন। পাখিরাও যেন তাঁকে ঠিক চিনতে পারত। একবার একটু ঝড় হওয়ার জন্যে পাখিগুলির বাসা ভেঙে যাওয়ায় পাখিগুলি আর আসছে না কিছুদিন। মহারাজ তাদের পরপর কয়েকদিন দেখতে না পেয়ে, জনৈক সন্ন্যাসীকে ডেকে বলছেন, 'দেখো তুমি গাছের ডালগুলি কেটে দিলে তো, সেইজন্যে পাখিগুলি সব চলে গেল।' আবার গাছে সার দেওয়া হয়েছে। সরল বালকের মত পূজ্যপাদ মহারাজ অনুযোগ জানাচ্ছেন, 'দেখো তোমরা

এই গাছে সার দিয়েছো, তার গন্ধে আর পাখিগুলি আসছে না।' সেবকরা মহারাজকে বোঝালেন আসল কারণগুলি। যাইহোক, কয়েকদিন পরে আবার যখন পাখিগুলি আসতে শুরু করল তখন মহারাজ আশ্বস্ত হলেন।

যেকোন দুঃখ-পীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর করুণা ছিল অপরিসীম। শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শের এক মূর্ত বিগ্রহ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু কখনই পছন্দ করতেন না যেসব সেবাকাজ তিনি করছেন তা অন্যেরা জানুক। কাউকে কিছু দেওয়া হলে, ছবি তোলায় তাঁর ছিল ঘোর আপত্তি। বলতেন, 'ওসব বিজ্ঞাপনের দরকার কি আছে ?' যে অর্থ প্রণামী হিসেবে আসত, তা অনেকের জন্যে নিজে হাতে মানি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দিতেন। অনেক সময় আশ্রমের সাধুরাও তা জানত না। একবার কাশীপুর মঠের এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করছেন যে যেসব প্রণামীর অর্থ জমা পড়েছে, তা গেল কোথায় ? সন্ন্যাসী-সেবক সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানিয়ে দিলেন সম্পূর্ণ হিসেব, কোথায় কত টাকা রাখা আছে ইত্যাদি। শুনে মহারাজ যেন নিশ্চিন্ত হলেন, বললেন, 'হ্যাঁ তাই বল। আমি তো ভাবছি, নাহলে আমার সংসার চলবে কেমন করে ?' তাঁর সংসার আসলে আর কিছুই নয় – মালদা, কামারপুকুর, রাঁচি, মুম্বাই, বরানগর, কাশীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অগণিত দুঃখী-দরিদ্র মানুষ, যাঁরা তাঁর অকৃপণ দয়ার স্পর্শে ধন্য হয়ে রয়েছে সারাজীবন। একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী জানিয়েছেন যে, মুম্বাই থাকাকালীন কত ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার জন্যে মহারাজ আশ্রমে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কোনদিন সেই নিয়ে কোন বিরক্তি প্রকাশ করেন নি তিনি।

শিশুদের ভালোবাসতেন খুব। সর্বত্রই যেখানে যেতেন শিশুরা তাঁর কাছে এলে কিছু-না-কিছু পেতো। কাশীপুরেই কত শিশু যে তাঁর কাছে আসত, তিনি তাঁদের নিজে হাতে বা সেবকদের বলে লজেন্স দিতেন। সেবককে বলতেন, 'ওদের বেশী করে দাও। ওরা কি আর প্রণামের জন্যে আসে ? ওরা ওই লজেন্সের জন্যেই আসে যে।' কাশীপুরে গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্পের বাচ্চাদের জন্যেও ছিল মহারাজের অসীম করুণা আর সহানুভূতি। মাঝে মাঝেই চলে যেতেন তাদের কাছে। গিয়ে দেখতেন, কি খেতে দেওয়া হচ্ছে। তাদের মাঝে মাঝেই ভাল করে খাওয়ানোর জন্যে নির্দেশ দিতেন আশ্রমের ভাণ্ডারী মহারাজ ও ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীকে। আবার নিজে গিয়ে সেই বিশেষ দিনেও দেখতেন ছেলেরা কত তৃপ্তি ভরে খাচ্ছে। এ যেন সত্যই তাঁর 'নারায়ণের ভোগ দেওয়া'।

এক অভিরাম আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করে গেছেন পূজ্যপাদ মহারাজ। তাঁর সেই জীবনের স্পর্শে কত জিজ্ঞাসু তৃপ্তি পেয়েছে, কত মানুষ জীবনে সঠিক পথের দিশা পেয়েছে, কত তরুণ-তরুণী ত্যাগের মহত্তম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ও সারদা মঠে যোগদান করেছে। একবার এক সেবক তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'মহারাজ আপনি কত জপ করেন ?' মহারাজ উত্তর দিলেন, 'কেন ১০ থেকে ১৫ হাজার।' তিনি বলতেন যে, তাঁর গুরু ছিলেন

গম্ভীরাত্মা পুরুষ। কিন্তু স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, তাঁর গুরু তাঁকে মালা দেন নি, বলেছিলেন হাতে জপ করতে, কারণ ভগবান হাত দিয়েছেন তো জপ করার জন্যেই। যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা জানিয়েছেন যে, যখন তিনি রাস্তায় হাঁটতেন বা বসে থাকতেন একা, দেখা যেত, তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলি ঘুরে চলেছে – মহারাজ নিজের মনে জপ করে চলেছেন। গাড়ীতে করে যখন অন্যত্র যেতেন, তখনো দেখা যেত, করজপ করে চলেছেন শান্ত মনে। ভক্তদেরও তিনি খুব উৎসাহ দিতেন এই করজপের জন্যে। পূজ্যপাদ মহারাজ অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন মানসজপকে। একবার এক সেবককে বলেছিলেন, 'দেখো, মানসজপ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জপ। আমি বোম্বে থেকে এই অভ্যাস শুরু করেছি।' সেবক যখন বললেন, 'কই মহারাজ আমাদের তো হয় না।' মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হবে, হবে, অভ্যাস করতে থাকো। জপ করতে থাকো, হবে। ভগবানের কাছে যা চাইবে, তাই পাবে।' ভক্তদের খুব উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'খুব করে ভগবানের নাম করবে। ব্যাকুলতা বাড়ানোই আসল। ঠাকুরকে দেখো নি।' একবার এক সেবক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মহারাজ, আপনি ভগবানকে দেখেছেন ?' শুনেই মহারাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় হো হো করে উচ্চহাস্য করে ওঠেন। বোধ হয় আগ্রহী জিজ্ঞাসুকে, অগণিত ভক্তকে, ভাবীকালের সাধককে সেই আনন্দসিদ্ধ মূর্তিটি নির্ভাষ হাস্যোজ্জ্বলতায় এভাবেই জানিয়ে দিয়ে গেল তাঁর অন্তর্লোকে দৃঢ়স্থিত উপলব্ধির ভূমিটিকে, স্বরূপসন্ধানে তাঁর নিজস্ব প্রাপ্ত অমূল্য সম্পদকে।

আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। তখন তিনি কামারপুকুরে। ঠাকুরের উৎসবের আগের দিন মহারাজ আশ্রমের ভাণ্ডারীকে ডেকে বলছেন, 'দেখো এবারে তো ঠাকুরের জন্যে কেউ কড়াইশুঁটির কচুরি নিয়ে এলো না ? এখনো অন্তত কেউ আমাকে বলে নি যে, কেউ এমন কিছু করে আনবে। দেখো, কি হয় !' এ ঘটনার দৃশ্যপট এবার কামারপুকুর থেকে চলে আসবে চন্দননগরে। সেদিন চন্দননগরের একজন ঠাকুরের ভক্ত নিজে কাজ থেকে ফেরার সময় রাস্তার পাশে দেখেন একজন সবজি বিক্রেতা অনেক কড়াইশুঁটি নিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর কি যে মনে হল, প্রায় সমস্ত কড়াইশুঁটিই কিনে নিলেন তিনি। তারপর বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে বললেন যে যদি কড়াইশুঁটির কচুরি তৈরী করা যায়, তাহলে তিনি তা পরের দিন ভোরবেলা কামারপুকুরে গিয়ে ঠাকুরের জন্যে দিয়ে আসবেন। স্ত্রী প্রথমে ভাবছিলেন, এতটা এই অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে করা সম্ভব হবে ? তখন ভদ্রলোক একটু জোর দিয়ে বললেন যে না হয়ে যাবে। তাঁরা দুজনে মিলে প্রয়োজনে সারারাত ধরে একটু কষ্ট করে হলেও তা করে ফেলতে পারবেন। দুজনে মিলে দীর্ঘক্ষণ ধরে তৈরী করে ফেললেন কড়াইশুঁটির কচুরি। সকালে নিয়ে পৌঁছে দিলেন ঠাকুরের জন্যে। সকলে তো অবাক। সিদ্ধসংকল্প ভক্ত-সাধকের প্রার্থনা ভগবানের কর্ণকুহরে নিশ্চয়ই পৌঁছেছিল সেদিন।

বৃন্দাবন আর নবদ্বীপের প্রতি তাঁর একটি গভীর টান ছিল। ভগবান কৃষ্ণ এবং অবতারপুরুষ চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত এই স্থানগুলিতে যখনই মহারাজ পৌঁছাতেন, তখন তাঁর মনে অন্যরকম একটি ভাবের উদয় হতো। যেন অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতেন ভগবানের অপূর্ব লীলারূপটিকে। তাঁর কোন এক সেবকের সঙ্গে কোনভাবে নবদ্বীপের যোগ আছে, তা তিনি জানতেন। তাই শেষের দিকে কখনো কখনো বলতেন, 'দেখো আমার এমন অবস্থা যে শেষে নবদ্বীপের লোকের কাছ থেকে সেবা নিতে হচ্ছে।' একদিকে তীর্থমাহাত্ম্যকে আত্মীকৃত করে তীর্থগৌরবকে প্রতিষ্ঠাদান, আর একদিকে কি অনন্য নিরভিমানিতা।

নিজের জন্যে কোনদিন কিছু আলাদা করে চাইতেন না তিনি। একবার তাঁরা কয়েকজন সন্ন্যাসী মিলে উত্তরভারতে কেদারনাথ-বদ্রীনাথ প্রভৃতি তীর্থদর্শনে গেছেন। পথে একটি স্থানে একটি হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। কিন্তু হোটেলের খাবার এতই নিম্নমানের, যে অন্যদের তা কিছুতেই মুখে উঠছে না। মহারাজ অবশ্য নির্বিকারভাবে তাই খেয়ে চলেছেন। কিছুক্ষণ পরে একজন পরিচিত ভক্ত এসে তাঁদের আর একটি ভাল হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ার আয়োজন করে দিল। সবাই সেই খাবার পেয়ে খুব খুশী। মহারাজ কিন্তু এখানেও কোন বিশেষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে আগের মতই চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগলেন। 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট' সাধকপ্রবরের এই রূপটি সকলকেই মুগ্ধ করে। এমনটি তাঁর জীবনে বহুবার দেখা গিয়েছে।

সেবকদের প্রতি বিশেষ নজর ছিল তাঁর। তাঁর খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বারবার খোঁজ নেবেন সেবকদের খাওয়া হয়েছে কিনা। এমনিতে নিজের জন্যে বিশেষ কোন সেবা নিতে চাইতেন না। নিজের কাজ নিজে করে নেবেন, এমনটাই ছিল তাঁর পছন্দ। তবুও শেষের দিকে যখন সেবকদের উপর নানা কারণে একটু বিশেষ নির্ভর করতে হচ্ছে, তখন মহারাজের গলায় খেদ প্রকাশ পেয়ে যেত এইজন্য যে তাঁর জন্যে সেবকদের কষ্ট হচ্ছে। কি অসামান্য এক সাধুজীবন, যার সবটাই কেবল অন্যের জন্যে নিবেদিত, নিজের জন্যে সেখানে ভগবৎ-শরণাগতি ছাড়া আর কিছুই রাখা নেই।

পূজ্যপাদ মহারাজের নিজস্ব ভাবে পড়াশুনার একটি অননুকরণীয় অভ্যাস ছিল। প্রচুর পড়াশুনা করতেন তিনি – বিশেষত এই কাশীপুর পর্বে। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর বই নিত্য পড়তেন তো বটেই, এছাড়াও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রকাশিত নানা পত্রিকা তথা উদ্বোধন, বেদান্ত কেশরী, প্রবুদ্ধ ভারত, গোলপার্ক থেকে প্রকাশিত বুলেটিন, সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। যেসব পড়ে ভালো লাগত, সেগুলি আবার পড়ে শোনাতেন সেবকদের। এত গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তেন যে, অনেক সময় সামনে সেবকরা কেউ এসে দাঁড়ালেও টের পেতেন না।

একজন সন্ন্যাসীকে অন্য এক আশ্রম থেকে হঠাৎ করেই ডেকে নিয়ে গেছেন। দূরে একাধিক আশ্রমে মহারাজের কিছু অনুষ্ঠান আছে সেই জন্য। সন্ন্যাসীটিও আনন্দে রাজী হয়ে গেছে। তবে তার নিজেরও একটি বিশেষ কাজ ছিল অন্য একটি আশ্রমে। তাই তার দরকার ছিল একদিন অতিরিক্ত থেকে আসার। সে তাই ঠিক করেছে মহারাজের আসার পথে কোন এক জায়গায় সে আলাদা হয়ে যাবে। মহারাজ যখন একথা শুনলেন, তখন বললেন, 'না আমিও একদিন বেশী থেকে যাবো। তুমি আমার চেয়ে ছোট হয়ে আমার জন্যে এত সময় দিতে পারলে, আর আমি বড় হয়ে তোমার জন্যে এটুকু করতে পারবো না ?' আজো সেই সন্ন্যাসী এই কথাগুলি স্মরণ করেন গভীর শ্রদ্ধায়, আবেগে। একজন অনেক নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি এত প্রবীণ একজন সন্ন্যাসীর কি অদ্ভুত ভালোবাসা। 'ভালোবাসাতেই তাঁর সংসার চলছে' – শ্রীশ্রীমায়ের এই কথাগুলি যেন পূজ্যপাদ মহারাজের জীবনে বাণীমূর্তি লাভ করেছিল।

এক মহিলা সদ্য তাঁর কন্যাকে হারিয়ে উন্মাদিনীপ্রায়। কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছেন। মঠের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁকে পূজ্যপাদ মহারাজের কাছে পাঠান কাশীপুরে। মহারাজ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর মনের দুঃখের কথা শুনেছেন। অবশেষে তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন। পরে একাধিক দিন তাঁকে ঠাকুরের প্রসঙ্গ শুনিয়েছেন। ধীরে ধীরে সেই কন্যাহারা মায়ের প্রাণে শান্তি ফিরে এসেছে।

করোনা অতিমারীর সময় একজন ভক্ত কাশীপুরে মহারাজের বিশেষ অনুমতি নিয়ে ঠাকুর ও মহারাজকে দর্শন করতে এসেছে। মনে মনে তার ইচ্ছা যদি ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী তখন কাশীপুর মঠেও ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া বন্ধ রয়েছে। ভক্তটি যেহেতু নিজেও তা জানে, তাই মনে ইচ্ছা থাকলেও, সে ব্যাপারে সে মহারাজকে বা অন্য কাউকেই জানায় নি। পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করে যখন সে আশ্রম থেকে চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন হঠাৎ মহারাজ তাঁকে পিছন থেকে ডেকে বললেন, 'কি গো তুমি প্রসাদ পেয়ে যাবে না? আজ এখানে প্রসাদ পেয়ে তবে যাও।' স্তম্ভিত হয়ে যায় ভক্তপ্রাণ। এমন কৃপা কীভাবে মিলতে পারে, তার হদিশ করতে পারে না সে, শুধু চোখে নেমে আসে জলের ধারা।

এক ভক্ত সাংসারিক নানা সমস্যায় পড়ে খুব বিপন্ন। মহারাজকে চিঠিতে জানিয়েছেন সে কথা। মহারাজ সহজ কথায় লিখলেন তাঁকে, 'My opinion is that the more you think about this, the more your peace of mind will be disturbed. It affects your spiritual and secular life. Render your Seva regularly and repeat the name of God (Mahamantra) as much as you can. Remember, Sri Ramakrishna is the embodiment of Truth eternal. Believe it and stick to the truth. I shall be pleased if you take the name of God and work in the way, shown by

Swamiji.' কি দৃঢ় বিশ্বাস ! কি অপূর্ব সমাধান ! ঈশ্বরপরায়ণতা তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। তারই ভিত্তিভূমি থেকে উঠে আসছে সব সমাধান। সাধারণত মহারাজ খুব বেশী বক্তৃতা করা পছন্দ করতেন না। কাশীপুরে একবার যুব সম্মেলনে হঠাৎই বক্তৃতা দিলেন। সেদিন যেন কোন্ এক ঐশী শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল তাঁর মধ্যে। কোনো লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন নি সেদিন। নিজে থেকেই বলেছিলেন যুবকদের স্বামীজীর বাণী। বারবার জোর দিয়ে বলছিলেন যে এই যুবকদের বিশ্বাস করতে হবে যে তাঁদের মধ্যে সেই ব্রহ্মশক্তি বিদ্যমান। অত্যন্ত তেজস্বী গলায় মহারাজের সেই পুনঃ পুনঃ আহ্বান সেদিন সকলকে অভিভূত করেছিল, মনে হয়েছিল অনেকের, যেন স্বামীজী স্বয়ং তাঁর মধ্যে থেকে কথা বলছেন।

এইভাবেই এগিয়ে চলেছিল মহারাজের দিব্যজীবনধারা। সাধারণভাবে মহারাজ খুব বেশী কিছু অসুস্থতায় ভুগতেন না। তবে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার সমস্যা ছিল। তবুও দীক্ষাদান এবং অন্যান্য কার্যাবলী যথানিয়মেই চলছিল। ২০২০-র মার্চে করোনা মহামারীর প্রকোপ আরম্ভ হওয়ার পর মহারাজ আশ্রমেই থাকতেন। এমনিতে এই পর্বে সুস্থই ছিলেন। শুধু যেন মনে হচ্ছিল কোন একটি প্রস্তুতি চলছে নিজের ভিতরে। একদিন সেবকদের ডেকে নিজের অনেক জিনিসপত্র বিলিয়ে দিলেন সকলের মধ্যে। তবুও অন্যেরা বুঝতে পারেন নি যে, এই বিতরণের মাঝে ভিন্ন তাৎপর্য লুকিয়ে থাকতে পারে ; মন এমন কল্পনাও করতে চায় নি যে, এরই মধ্যে কোন বিদায়ের সংকেত নিহিত আছে।

একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁর আশ্রমে সদ্য-যোগদান-করা পূজ্যপাদ মহারাজের আশ্রিত এক ব্রহ্মচারীকে নিয়ে গেছেন মহারাজের দর্শন করানোর জন্যে। মহারাজ খুব খুশী হলেন, কিন্তু বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন দুপুরের প্রসাদ পেয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু এই প্রবীণ সন্ন্যাসী করোনা মহামারীর সময়ের নিয়ম এবং পূজ্যপাদ মহারাজের শরীরের কথা ভেবে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক হবে না মনে করে, মহারাজকে বুঝিয়ে ফিরে এলেন আশ্রমে। কিন্তু আসার সময় থেকেই বারবার তাঁর মনে হত লাগল কেন তিনি মহারাজের কথা শুনলেন না। তাই আশ্রমে ফিরে এসে পূজ্যপাদ মহারাজের সচিব-সেবক মহারাজকে জানালেন যে মহারাজের ইচ্ছানুযায়ী কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি আশ্রমে প্রসাদ পেয়ে আসবেন। সচিব-সেবক জানালেন যেন আরো কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে নিয়ে তিনি আসেন। সেইমত পরে আর একদিন তিনি কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে নিয়ে আবার মহারাজের কাছে গেলেন এবং মহারাজের নির্দেশমত আশ্রমে প্রসাদ পেয়ে এলেন। সেদিন মহারাজকে প্রণামের সময় দেখলেন মহারাজের মুখের হাসি। কে বলতে পারে, এই স্মিত আনন্দরূপের তৃপ্তি-মণ্ডিত প্রকাশে আসন্ন বিদায়ের শোকাতীত কোন আভাই আসলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কিনা।

সেপ্টেম্বরে শেষ দিকে একদিন সকালে মহারাজ স্নান করে বেড়ানোর পর সেবকরা লক্ষ্য করলেন যে মহারাজের যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মহারাজকে বারবার জিজ্ঞাসা করলেও, মহারাজ বলতে লাগলেন যে তাঁর কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু সেবকরা বুঝতে পারছিলেন মহারাজের কষ্টটা। সেই জন্যে সেবকরা একটু জোর করেই মহারাজকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন সেবাপ্রতিষ্ঠানে। চিকিৎসকরা দেখে বুঝতে পারলেন যে, মহারাজের শরীরে নানারকম ইনফেকশান দেখা দিয়েছে। তাঁরা এও জানালেন যে, ইনফেকশনের মাত্রাটাও যথেষ্ট বেশী। তাঁরা নানারকম অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে মহারাজের অসুস্থতাকে নিয়ন্ত্রণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করতে শুরু করলেন। মোটামুটি ১০-১৫ দিন প্রায় অসুস্থ ছিলেন। তারপর একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পর ডাক্তাররা মহারাজকে ছেড়ে দিলেন। মহারাজ আশ্রমে ফিরে এলেন। কিন্তু দেখা গেল, মহারাজ আশ্রমে ফিরে এসেও ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করছেন না, তাঁর যে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত জীবন, সেটি যাপনেও মহারাজের নানা অসুবিধা হচ্ছে। সেবকরা এটি লক্ষ্য করে পুনরায় তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে গেলেন। এবার দেখা গেল, মহারাজের সোডিয়াম-পটাসিয়ামের মাত্রায় সমস্যা হচ্ছে। তখন ডাক্তাররা এর জন্যে আলাদা করে নানারকম চিকিৎসা শুরু করলেন। কিন্তু মহারাজের প্রস্রাবের ইনফেকশান থেকেই গিয়েছিল। তাঁর জন্যে ক্যাথিটারও বসানো হয়েছিল। এরই সঙ্গে শুরু হয়েছিল নতুন আর একটি উপসর্গ। কিছু তরল খাবার খেতে গেলেই তা মহারাজের শ্বাসনালীতে চলে যাচ্ছিল এবং কাশি শুরু হয়ে যাচ্ছিল। তাই ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী তরল খাবার দেওয়ার জন্যে রাইল্‌স্ টিউব লাগানো হল। যদিও সেমি-সলিড খাবার মহারাজ মুখ দিয়েই খেতে পারছিলেন, শুধু সুপ, চা, জল ইত্যাদি তরল খাবার খাওয়ানোর সময় রাইল্‌স্ টিউবের সাহায্য নেওয়া হত। মজা করে বলতেন, 'এই একটা হয়েছে কান দিয়ে খাবার দেওয়া। এ কতদিন চলবে ? আমি কি মুখে করে খেতে পারি না ?' সেবকরা বুঝিয়ে বলতেন, 'না মহারাজ, আপনি এখন সবটা তো মুখ দিয়ে খেতে পারছেন না, আপনার অসুবিধা হচ্ছে, তাই এই ব্যবস্থা।' যাই হোক, ডাক্তাররা কিছুদিন পরে জানালেন যে, রাইল্‌স্ টিউব পালটে তাঁরা অন্য একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলে 'পেগ টিউব'। এটি মহারাজের পেটের সঙ্গে যুক্ত হবে। এতে মহারাজের সুবিধা হবে। আসলে, রাইল্‌স্ টিউব প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর পালটে দিতে হত। এই পরিবর্তনের সময়টি মহারাজের কাছে খুব বেদনাদায়ক ছিল। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত এই পেগ টিউব-এর জন্যে মহারাজের একটি অন্য ওষুধ বন্ধ করার দরকার ছিল। সেটি চিকিৎসকদের নির্দেশে যথারীতি বন্ধ করাও হয়েছিল। শুক্রবার, ১২ তারিখ অপারেশান হল। সকালে ডঃ প্রদীপ চক্রবর্তী, যিনি মেডিসিনের ডাক্তার, মহারাজের ঘরে আসতে মহারাজ নিজেই ডাক্তারবাবুকে বললেন, 'ডাক্তারবাবু আজ অপারেশান একটু পরেই ওটিতে যাবো।' ডাক্তারবাবুও বললেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, একটা ছোট্ট অপারেশান।' ডঃ অচিন্ত্য দাসের নেতৃত্বে বেলা সাড়ে ১১টায় অপারেশান

হল। মাত্র ৪৫ মিনিটের অপারেশান। ডাক্তারবাবুরাও জানালেন অপারেশান সফল হয়েছে। কোন অসুবিধা হয় নি। মহারাজকে নিজের ঘরে বেডে নিয়েও আসা হল। মহারাজকে দেখেও তখন কোন আলাদা অসুস্থতা দেখতে পান নি কেউই। সাড়ে তিনটের সময় একটু কাশলেন। একটু কফ বেরোলো। সেবক গিয়ে তা পরিষ্কার করে দিলে7ন। তারপর আবার একটু কাশলেন। এবার দেখা গেল, কাশির সঙ্গে একটু রক্ত বেরোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সেবকরা চিকিৎসকদের খবর দিলেন। মহারাজ নিজেই সেবকদের বললেন, 'দেখো, উলটি পাচ্ছে।' চারটের সময় আবার একই রকম বমি করলেন। এবার সেবকদের বললেন, 'দেখো আমার খুব ব্যথা হচ্ছে, আমায় একটু উঠিয়ে দাও।' ব্যথাটা ঠিক কোথায় হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছিল না। কখনো দেখাচ্ছেন বুকে, কখনো অন্য কোথাও, কখনো বা বলছেন, 'আমার পা-টা একটু টিপে দাও।' ডাক্তাররাও প্রথমে বুঝতে পারছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে ইসিজি করা হল। ইসিজিতেও তেমন কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু রক্তচাপ তখন হঠাৎই নামতে শুরু করে দিয়েছে। ডাক্তাররা দ্রুত এসে আইসিইউ এবং ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন। ডাক্তার-নার্স সবাই মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মহারাজ আর চিকিৎসায় সাড়া দিলেন না। এক 'Massive Heart Attack'-এর পরিণতিতেই সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে মহারাজ চলে গেলেন তাঁর বাঞ্ছিত ধামে। মহাসমাধির সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। দূরদর্শন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিন আন্তর্জালিক মাধ্যমের সাহায্যে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। রাত সাড়ে ৯টা-১০টা নাগাদ তাঁর পূত শরীর নিয়ে আসা হল রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। সারারাত তাঁর আশ্রিত ও গুণগ্রাহী ভক্তকুল, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী মহারাজেরা শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন মহারাজকে। পরেরদিন অর্থাৎ ১৩ মার্চ সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে পূজ্যপাদ মহারাজকে নিয়ে আসা হল বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে – রাখা হল তাঁকে সংস্কৃতি ভবনে। অগণিত ভক্ত, সাধু-ব্রহ্মচারীরা সারাদিন ধরে সারিবদ্ধভাবে তাঁকে দর্শন করে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে থাকলেন। রাত ৯টা ১৫ মিনিটে সাধু-ব্রহ্মচারীরা এই মহান সন্ন্যাসীর পবিত্র মর্ত্যদেহখানি নিয়ে সমগ্র মঠ প্রাঙ্গণ ধরে এগিয়ে চললেন। রাজা মহারাজের মন্দির হয়ে মায়ের ঘাটে পৌঁছে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করা হল। এরপর স্বামীজীর মন্দির হয়ে তা পৌঁছে গেল পরম পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজজীর ভবনের সামনে। পরম পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজজীর কাছ থেকে ধীরে ধীরে তা এগিয়ে চলল সমাধিঘাটের দিকে। পূততোয়া গঙ্গা বয়ে চলেছে উজান থেকে মোহানার দিকে। থমকে আছে রাতের পৃথিবী। অন্ধকারের মধ্য থেকেও উঠে আসছে আলোর রেখাগুলি। পবিত্র বহ্নিশিখা নিয়ে প্রদক্ষিণ করে শেষে অগ্নিসংযোগ করা হল সে সাধকশরীরে। উপস্থিত সাধু-ব্রহ্মচারীদের সমবেত কণ্ঠস্বর রাতের আঁধার পার হয়ে গানের সুরে ঘোষণা করল, 'ওই যে দেখা যায় আনন্দধাম।' সাতষট্টি বছর আগে এই বেলুড় মঠের ভূমিতে অনুপম যে রামকৃষ্ণ-আশ্রিত জীবনের সূচনা হয়েছিল, আজ সে জীবন 'শোকাতিগ' আনন্দধামযাত্রী।

যাস্ক মুনির বিখ্যাত 'ষড়্-বিকার' নামে পরিচিত সূত্র-উক্তিতে জীবশরীরের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ছয়টি পর্যায়ের ক্রম উল্লিখিত আছে। প্রতিটি জীব তথা মানুষকেই এই ক্রম পার হয়ে যেতে হয়। এ তো জীবনের অপরিহার্য ধ্রুব পরিণাম। কিন্তু তবুও মানুষের বিশ্বে এমন কিছু জীবন আসে, যারা শরীরী ক্রমের পরিণতির বাইরে দাঁড়িয়ে আগত ও অনাগত পৃথিবীর জন্য রেখে যান কিছু অমূল্য সম্পদ। সে সম্পদ পার্থিব জগতের তুলাদণ্ডে মাননীয় নয়। অন্তর্জ্যোতির আলোকে তার উদ্ভাসন। আত্মজ্ঞানের সাধনায় তার অমূল্যে মূল্যপ্রাপ্তি। ভগবৎ-মুখী জীবনের ঐকান্তিকতায় তার অনির্বাণ মণিদীপ্তি। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বাগীশানন্দজীর জীবনে এরই প্রতিষ্ঠা, এরই প্রকাশ। আড়ম্বরে কাউকে কাছে টানেন নি তিনি। নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আন্তরিকতায় সকলকে আপন করে নিয়েছেন মহারাজ। কর্মোদ্যোগের বিশালতায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি তিনি, শিবজ্ঞানে জীবসেবার নিঃশব্দ সাধনায় দিনাতিপাত তাঁর। বলায়-লেখায় সারস্বত বহুমান্যতার দিকে ফিরে তাকান নি তিনি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তযাপনকে করে তুলেছেন শাস্ত্রের রূপায়ণ।

অগণিত ভক্তজনের হৃদয়ে তিনি আশ্রয়ের দীপশিখা। উত্তরকালের সাধকদের কাছে তিনি নবযুগ-তপস্যার দুর্গম পথচলায় এক আলোকনন্দিত জীবন। যে সাধকের দল হয়ত এখনো এসে পৌঁছায় নি, অনাগত ভাবীকালে তারা যখন পড়বে ও শুনবে এমন এক মহিমময় অথচ নিরৈশ্বর্য জীবনের প্রশান্ত, আত্মমগ্ন সাধনার আখ্যান, তখনও তারা প্রাণিত হবে, নিজেদের কোন জিজ্ঞাসার মুহূর্তে এই জীবনের কাহিনিই তাদের কাছে হয়ে উঠবে জীবন্ত উত্তর।

রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভাবধারায় পূজ্যপাদ মহারাজ সেই অলোকসামান্য সাধকপুরুষ যাঁর মধ্য দিয়ে প্রমূর্ত হয়েছে এই ভাবপ্রবাহের যাবতীয় ঐতিহ্যের দীপ্তিকণা। ইতিহাসের বড় দুর্যোগময় লগ্নে মহারাজ নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন এই ভাবগঙ্গার পাবন ধারায়। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক মহাপ্রাণ সাধুর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি। সেই উত্তরাধিকার তাঁর জীবনের সোনার ফ্রেমে চিরকালের জন্যে সঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তাই সেখানে যা কিছু ঘটেছে, যা কিছু উপলব্ধি উদ্ভাসিত হয়েছে, সবকিছুর মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক মহনীয়তার অভিরাম অভিজ্ঞান।

আমাদের দিনযাপনের গ্লানি আর নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালির মাঝে পূজ্যপাদ মহারাজের অম্লান হাস্যময়, অপরূপ আনন্দঘন, সাধনদীপ্র অনুভূতিময় দিব্য ভাগবত জীবন হয়ে থাকবে না-নেভা জ্যোতির যাগপ্রদীপ। অনাগতকালের সাধক এই দিব্যজীবনের আখ্যান শুনে শুধু বলতে পারবে, 'হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ' 'হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ'। তাঁর বলা-কথা আর চলা-পথে নিত্য ঝড়ে পড়বে সেই উজ্জ্বল ফুলের পাপড়িগুলি যার সৌরভে-সৌন্দর্যে উত্তরকালও হবে নন্দিত আর ঋদ্ধ।